নির্বাণ

শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর

এই গ্রন্থে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি লেখিকা-কর্তৃক অঙ্কিত
৬৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিঠি রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত শেষ পত্র—
ইহাই তাঁহার শেষ স্বাক্ষর।

প্রথম সংস্করণ—১ বৈশাখ, ১৩৪৯

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

"স্নেহের অজস্রতায়
সমাপ্তির শেষ কথা
চিত্তে দিয়ে গেলে ভরে।
সেই নীরব কণ্ঠের বাণীর ইঙ্গিত
পূর্ণ ক'রে থাক্ আমাদের
নিত্য নিবেদনের থালা॥"

নির্বাণ

১৯৪০ সালের অগস্টের শেষে বর্ষামঙ্গলের আয়োজন বাবামশায়ের[১] আদেশে শুরু করা হোলো। কিন্তু আমার পক্ষে উৎসব পর্যন্ত থাকা সম্ভব হোলো না। অসুস্থতার দরুন বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের পূর্বেই আমাকে কালিম্পঙ যাত্রা করতে হোলো। রওনা হবার পূর্বদিন সন্ধ্যার পর বাবামশায়ের কাছে বিদায় নিতে উদীচীতে[২] গেলুম, কেননা, ভোরের গাড়িতে কলকাতা যেতে হবে।

দেখি, উদীচীর উপরের বারাণ্ডায় চুপ ক'রে বসে আছেন, তখন রাত হয়েছে অনেক, সামনে দীর্ঘ বকায়ন গাছের ঘন ছায়া পড়েছে বারাণ্ডায়, মাথার উপর তারাগুলো স্তব্ধ। তাঁর পায়ের কাছে বসতে, বললেন, "ভালো করে সেরে এসো মা। আমিও ছুটির পর মৈত্রেয়ীর[৩] ওখানেই যাব, তুমি পরে ওখানেই এসো।" তাঁর স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর কান থেকে যেন এখনো মুছে যায়নি। তার পর কলকাতা হয়ে অগস্ট মাসের শেষে পাহাড়ের দিকে যাত্রা করলুম। মংপুতে মাঝ-রাস্তায়

১. গুরুদেব ২. উত্তরায়ণে কবির শেষ-সময়কার বাসগৃহ ৩. শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

এক সপ্তাহের জন্য থেমেছিলুম। সেখানে তাঁর এই চিঠিখানি পাই :

বৌমা,

তোমার বাড়িটা দেখি শূন্য হাঁ হাঁ করছে, না আছ তুমি, না আছে রথী, প্রধান ব্যক্তি যে, সে আছে নাথু[১]। নিদারুণ শরতের তাপ আকাশে এসেছে, কৃপণ-বর্ষণ কালো মেঘের ভিতর থেকে সমস্ত পৃথিবীকে অভিশাপ দিচ্ছে। হংসবলাকার দলে যদি নাম লেখা থাকত তাহলে উড়ে চলতুম মানস-সরোবরের দিকে। মংপুতে মাগুরমাছের সরোবর-তীরেও হয়তো শান্তি পাওয়া যেতে পারত। মধ্য-সেপ্টেম্বরের প্রতীক্ষায় রইলুম।

গল্পটা[২] শেষ হয়ে গেছে, এখন তাতে প্ল্যাস্টার লাগাচ্ছি। আজ রাতে দেবতা যদি প্রসন্ন থাকেন তাহলে গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে বর্ষামঙ্গল হবে। সকালে বৃক্ষরোপণ হয়ে গেছে। আমার শরীরে ভালোমন্দের জোয়ার-ভাঁটা চলছিল। সম্প্রতি ভালোই আছি। মংপুতে যাবার পূর্বে একটা কথা ব'লে রাখা ভালো। আহার্যের খরচ সম্প্রতি বেড়ে গেছে। শাকপাতা খাচ্ছিলুম, অবশেষে ডাক্তারের পরামর্শে মাছ-মাংস ধরতে হয়েছে। আমার সম্বলের মধ্যে শুনছি তোমার কাছে টাকা দশেক প্রচ্ছন্ন আছে। সেটাতে ক-দিন চলবে জানিয়ো, সেই অনুসারে ওখানকার মেয়াদ স্থির করতে হবে। মাংপবীকে[৩] আমার আশীর্বাদ জানিয়ো।

বাবামশায়

১. ভৃত্য ২. ল্যাবরেটরি ৩. মংপুনিবাসিনী, শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

বাবামশায় সকলের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে খুব ভালোবাসতেন। মেয়ে, বউ, পরিবারবর্গের সকলের সঙ্গে, এমন কি নীলমণি[১] ভৃত্যের সঙ্গেও হাস্য-পরিহাসে তাঁর ছিল সহজ আনন্দ। এই চিঠির মধ্যে তার পরিচয় আছে যথেষ্ট। যখন থেকে তিনি বৈষয়িক সংস্রব ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন থেকে কোনোদিন তাঁকে টাকা হাতে রাখতে দেখিনি। যদি কখনো কেউ কিছু প্রণামী দিয়ে যেত তখনি আমাকে ডেকে বলতেন, "তোমার ব্যাঙ্কে এটা জমা রাখো।" তার পর মাঝে-মাঝে সেটার হঠাৎ খোঁজ হোত, যেদিন মনে পড়ত। নিজের সম্পর্কে অর্থ-সম্বন্ধে কোনো হিসাবনিকাশের ধার ধারতেন না। যা প্রয়োজন ছোটোছেলের মতো সেটি পেলেই খুশী। টাকাকড়ি বা বিষয়সম্পত্তির সঙ্গে তিনি নিজে কোনো সম্পর্ক রাখেননি। কিন্তু শান্তিনিকেতন বা অন্যের সম্বন্ধে বৈষয়িক ব্যাপার উপস্থিত হোলে একজন উঁচুদরের বৈষয়িকের মতোই সব বুঝে পরামর্শ দিতেন।

আমি যখন কালিম্পঙে যাই তখন তিনি "ল্যাবরেটরি" গল্পটি লিখতে শুরু করেছেন। কিন্তু আজকাল গল্প

১. কবির ভৃত্য; রহস্যচ্ছলে কবি ডাকতেন নীলমণি বা লীলমনি, প্রকৃত নাম বনমালী

লিখতে ভারি দ্বিধা, বলেন, "আগেকার মতো তাড়াতাড়ি লিখতে পারি না, অনেক সময় নেয়।" তা-ছাড়া তাঁর নিজের লেখা-সম্বন্ধে তিনি খুব কড়া বিচারক ছিলেন, নিখুঁত না হোলে তাঁর কিছুতেই মন উঠত না, কতবার যে নিজের হাতে লেখা কপি করতেন, আর সেই সঙ্গে বদল করতেন তার ঠিক নেই, যদিও কপি করবার লোক আপিসে হাজির তবু তাকে দেবেন না। "ল্যাবরেটরি" গল্পটি লিখে', পড়তে তাঁর কত সংকোচ। লোকে ঠিক বুঝবে কিনা এই ছিল তাঁর সন্দেহ, সেইজন্য শ্রোতা-সম্বন্ধে তিনি ভারি খুঁতখুঁতে ছিলেন। যখন আজকাল তাঁকে নতুন লেখা পড়তে বলা হোত তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন এবং আশেপাশের লোকেরাও তাই সেই সঙ্গে তটস্থ হয়ে থাকত। এই রকম ঘটনার একটি ছবি মীরা দেবীর চিঠিতে কিছু পাওয়া যাবে, তাই চিঠির কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি। কালিম্পঙে গিয়ে এই চিঠি পাই :

ভাই বোঠান,

আমি এখানে আসার পরদিন দাদা[১] কলকাতা গেলেন, ওখান থেকে জমিদারিতে যাবেন। তুমি চলে যাওয়াতে, তার পরে দাদাও গেলেন, তাই বাবার মনটা ক-দিন খুব যাই-যাই করছিল। তার পর

১. শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখন আবার সেটা একটু কেটে গেছে। প্রথমে আরম্ভ করলেন যে, চোখটা খারাপ হয়েছে, তারজন্য কলকাতায় যেতে হবে। তার পরে সুধাকান্ত[১] জিতেনবাবুকে[২] ডেকে এনে সে-ধাক্কাটা কাটিয়ে দিল।

বর্ষামঙ্গল হয়ে গেল, বেশ ভালো হয়েছিল।

বাবা যে-গল্পটা[৩] লিখছিলেন সেটা শেষ হয়েছে দু-তিন দিন আগে, জন-কয়েককে প'ড়ে শুনিয়েছেন। সেদিন সকাল থেকে সে কী একসাইট্‌মেণ্ট বাবার, সকালে সুধাকান্তর সঙ্গে একদফা ঠিক হোলো কাকে-কাকে ডাকা হবে, সেই মতো মহাদেব[৪] পাড়ায়-পাড়ায় চিঠি বিলি করে এল, তার পরমুহূর্তে যেই সুধাকান্ত নাইতে খেতে বাড়ি গেছে আবার মহাদেব ছুটল সুধাকান্তকে ডাকতে। সুধাকান্ত আসতে আবার কী পরামর্শ হোলো, আবার চিঠি নিয়ে লোক দৌড়ল। সেদিন মহাদেব অনবরত ছুটাছুটি করেছে আর সুধীব কর বেচারা লেখা কপি করা নিয়ে বকুনি খেয়েছে তেমনি। বাবা এমন ইরিটেটেড মেজাজে ছিলেন, পড়া শেষ না-হওয়া পর্যন্ত যে-ক'টি আমরা উপস্থিত ছিলুম গল্প পড়ার সময় ভয়ে সব জুজু হয়ে বসে, কারোর মুখে হাসি নেই বা কথা নেই। উপরে গিয়ে চারিদিক তাকিয়ে মনে হোলো যেন আসামীরা কোর্টে হাজিরা দিতে এসেছে, এখন মনে করতে হাসি পাচ্ছে।

যে-বিষয় নিয়ে এত ভয় সঞ্চার হয়েছিল আসলে গল্পটা কিন্তু সে-রকম ভয়াবহ নয়। গল্পটা আরো এন্‌জয় করা যেত যদি গল্প

১. শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী ২. ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৩. ল্যাবরেটরি ৪. ভৃত্য

পড়ার ভূমিকাটা তদনুযায়ী হোত। আমি যেখানে বসেছিলুম সেখান থেকে অনিলবাবুর[১] চেহারাটা আমার চোখের সামনে ছিল, কাজে-কাজেই গল্প শুনতে-শুনতে সেদিকে আপনি চোখ পড়ছিল, আমি একটু অতিরঞ্জিত করে বলছি না, অনিলবাবু এমন মুখ কালি করে একটা হাতে ঠেস দিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে বসেছিলেন যে, সেদিকে তাকিয়ে মনে হোতে পারত যে, বিচারক বোধ হয় কারোর প্রাণদণ্ডের রায় পড়ে শোনাচ্ছেন, তাই শ্রোতাদের মুখে এই বেদনাসূচক ভাব। সুধাকান্ত ইচ্ছে ক'রে ঘরের বাইরে এমন জায়গায় বসেছিল যেখান থেকে তাকে না দেখতে পাওয়া যায় কাজেই তার চোখ-মুখের বর্ণনা দিতে পারলুম না। আর সুধীর কর বেচারী বাবার চৌকির পিছনে এমন জায়গায় লুকিয়ে ছিলেন যে, ভদ্রলোক সে-ঘরে আছেন ব'লে জানা যেত না, যদি না মাঝে-মাঝে তাঁকে কাঠগড়ার আসামীর মতো কাগজপত্র এগিয়ে দিতে খাড়া না হোতে হোত। গল্পটি হচ্ছে বর্তমান যুগের মেয়েদের নিয়ে। ... ইতি।

মীরা

বাবামশায় পাহাড় পছন্দ করতেন না, নদীর ধারই তাঁর ছিল প্রিয়, বলতেন, নদীর একটি বিস্তীর্ণ গতিশীলতা আছে, পাহাড়ের আবদ্ধ সীমার মধ্যে মনকে সংকীর্ণ ক'রে রাখে, তাই পাহাড়ে বেশিদিন থাকতে ভালো লাগে না। বহুকাল আগে রামগড়ে

১. শ্রীঅনিলকুমার চন্দ

তিনি একটি শৈলাবাস তৈরি করেন। সেখানকার বাড়ির নাম দিয়েছিলেন হৈমন্তী—তাঁর "হৈমন্তী" গল্প ঐ পাহাড়ের বাড়িতে লেখা। তিনি সব-সময় একটি কল্পিত বাসভবন মনে-মনে গড়ে তুলতেন, তার সঙ্গে বাস্তব-জগতের মিল হোত না কোনোদিন, তখন তিনি আবার গড়তেন নতুন বাসার কল্পনা। এইভাবে নতুন-নতুন বাড়ি তৈরি করে তোলাও তাঁর একটা শখ ছিল। এই রকমের কল্পিত বাসভবন বা স্টুডিয়োরুমের কথা একসময় তাঁর মনোলোকে যে-ছবি সৃষ্টি করত তারি ছায়া নিম্নের চিঠিখানিতে পাওয়া যাবে। তিনি ১৯৩০ সনে জর্মানি ভ্রমণ করেছিলেন, সেই সময় আমাকে চিঠিটা লেখা, আমরা তখন লণ্ডনে :

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি,—দিনের পর দিন। সবাই বলছে এমন কাণ্ড হয় না কখনো। আমি মনে-মনে ভাবছি,—এটা আমারি কীর্তি। আমি বর্ষার কবি। শ্রাবণ মাসে বর্ষামঙ্গল আমার পিছনে-পিছনে সমুদ্র পার হয়ে এসে হাজির। কিন্তু সত্যি কথা বলতেই হবে, "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে", এ কবিতাটি ঠিক খাটছে না। হৃদয় নাচছে না, দ'মে আছে। যাকগে—আগামী মঙ্গলবার যাব জেনিভায়। সেখানে আর-এক পালা। শুনছি

আয়োজন করেছে খুব বড়ো রকমের। আদর অভ্যর্থনার অভাব হবে না। ... ...

এখানকার ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে আমার পাঁচখানা ছবি নিয়েছে, শুনেছ। তার মানে, তা'রা পৌঁছবে অমরাবতীতে। ওরা দামের জন্য ভাবছিল, টাকা নেই কী করবে। আমি লিখে দিয়েছি যে, আমি জর্মানিকে দান করলুম, দাম চাইনে। ভারি খুশী হয়েছে। আরো অনেক-অনেক জায়গা থেকে একজিবিশনের জন্যে আবেদন আসছে। একটা এসেছে স্পেন থেকে, তারা চায় নভেম্বরে। ভিয়েনা চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যে পোটো সেই নামটাই ছড়িয়ে পড়ছে কবি নামকে ছাড়িয়ে। থেকে-থেকে মনে আসছে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে, শালবনের ছায়ায়—খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ খাড়া দাঁড়িয়ে, তারি পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে দুপুরবেলা, নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়াবীথি চলে গেছে, কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেছে, জারুল পলাশ মাদারে চলেছে প্রতিযোগিতা, সজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায়, অশথগাছের পাতাগুলো ঝিলমিল করছে—আমার জানলার কাছু পর্যন্ত উঠেছে চামেলি লতা। নদীতে নেবেছে একটি ছোটো ঘাট লাল পাথরে বাঁধানো, তারি এক পাশে একটি চাঁপার গাছ। একটার বেশি ঘর নেই। শোবার খাট দেয়ালের গহ্বরের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়। ঘরে একটিমাত্র আছে আরাম-কেদারা, মেঝেতে ঘন লাল রঙের জাজিম পাতা, দেয়াল বাসন্তী রঙের, তাতে ঘোর কালো রেখার পাড় আঁকা। ঘরের পুবদিকে একটুখানি বারান্দা, সূর্যোদয়ের আগেই সেইখানে চুপ

করে গিয়ে বসব, আর খাবার সময় হোলে লীলমনি সেইখানে খাবার এনে দেবে। একজন কেউ থাকবে যার গলা খুব মিষ্টি, যে আপন মনে গান গাইতে ভালোবাসে। পাশের কুটীরে তার বাসা, যখন খুশি সে গান করবে, আমার ঘরের থেকে শুনতে পাব। তার স্বামী ভালোমানুষ এবং বুদ্ধিমান, আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, অবকাশ-কালে সাহিত্য-আলোচনা করে এবং ঠাট্টা করলে ঠাট্টা বুঝতে পারে এবং যথোচিত হাসে। নদীর উপরে দুটি সাঁকো থাকবে, নাম দিতে পারব জোড়াসাঁকো—সেই সাঁকোর দুই প্রান্ত বেয়ে জুঁই, বেল, রজনীগন্ধা, রক্তকরবী। নদীর মাঝে-মাঝে গভীর জল, সেইখানে ভাসবে রাজহাঁস আর ঢালু নদীতটে চ'রে বেড়াচ্ছে আমার পাটল রঙের গাই-গোরু তার বাছুর নিয়ে। শাকসবজির খেত আছে, বিঘে দুইয়ের জমিতে ধানও কিছু হয়। খাওয়াদাওয়া নিরামিষ, ঘরে তোলা মাখন দই ছানা ক্ষীর, কুকারে যা রাঁধা যেতে পারে তাই যথেষ্ট—রান্নাঘর নেই। থাক্ এই পর্যন্ত। বাইরের দিকে চেয়ে মনে পড়ছে আছি বর্লিনে—বড়োলোক সেজে বড়ো কথা বলতে হবে—বড়ো খ্যাতির বোঝা বয়ে চলতে হবে দিনের পর দিন—জগৎজোড়া সব সমস্যা রয়েছে তর্জনী তুলে, তার জবাব চাই। ওদিকে ভারতসাগরতীরে অপেক্ষা করে আছে বিশ্বভারতী—তার অনেক দাবি, অনেক দায়—ভিক্ষা করতে হবে দেশে দেশান্তরে। অতএব থাক্ আমার স্টুডিয়ো। কতদিনই বা বাঁচব, ইতিমধ্যে কর্তব্য করতে-করতে ঘোরা যাক, রেলে চ'ড়ে, মোটরে চ'ড়ে, জাহাজে চ'ড়ে, ব্যোমযানে চ'ড়ে, সভ্যভব্য হয়ে। অতএব আর সময় নেই। ইতি ১৮ই অগস্ট, ১৯৩০ ১

বাবামশায়

১. "পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থের 'বাসা' কবিতাটি এই চিঠিখানারই রূপান্তর।

তাঁর কল্পনা ছিল রামগড়ের জমিতে অরচার্ডের বাগান করাবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়ি বিক্রি ক'রে দিতে হয়েছিল, এত দূরের রাস্তা ঘন ঘন যাতায়াত পোষাত না।

এদিকে আমি কালিম্পঙে পাহাড়ে পৌঁছবার তিন সপ্তাহ পরে টেলিফোনে খবর এল, বাবামশায় কাল কালিম্পঙ এসে পৌঁছবেন। বৃষ্টির পালা সবে শেষ হয়েছে, শরৎকালের আভা জেগে উঠেছে আকাশে বাতাসে। মনে-মনে খুশী হলুম যে, বাবামশায় মংপু না গিয়ে এখানে আসছেন। গৌরীপুর-লজের যে-সব ঘরগুলিতে থাকতেন সেগুলি তাঁর মনের মতো যেমন ক'রে গোছানো হোত তেমনি ক'রে সাজাতে শুরু ক'রে দিলুম। তখন পাহাড়ে নানা জাতের ফুল ফুটছে, তার মধ্যে হলদে দোলনচাঁপাই প্রধান উল্লেখযোগ্য। তারি গন্ধে বাগান থাকত মেতে। সেখানে সকালে উঠে ফুল-সাজানো ছিল একটি বিশেষ কাজ, একজন ইংরেজ মহিলা আমার সঙ্গে সেবার ছিলেন, তিনি এ-কাজটি সুচারুরূপে করতেন। আজ বাবামশায় আসবেন ব'লে বিশেষভাবে ঘরেতে ফুল-সাজানোয় ব্যস্ত ছিলুম। পুষ্প ও ধূপের গন্ধে ঘরগুলি অনাগত অতিথির প্রত্যাশার আভাসে পূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর বিশ্রামগৃহটি যখন পারিপাট্যের পরিচ্ছন্নতায় আরামের বিশিষ্ট রূপ

নিল তখন আমরা প্রতীক্ষা ক'রে রইলুম আমাদের পূজনীয় অতিথির।

উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় শুনি হর্ন বাজাতে-বাজাতে প্রকাণ্ড মোটরটা পাহাড়ের সরু রাস্তা বেয়ে নেমে আসছে। গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়াল; আমরা এগিয়ে গেলুম, সুধাকান্ত দেখলুম আগেই নেমে পড়েছে তার পর বাবামশায়কে হাত ধরে নামিয়ে নিলে। এবার তাঁকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছিল। তাঁকে ঘরে নিয়ে আসা হোলো, চৌকিতে বসলেন, আমরা সকলেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইলুম। বাবামশায় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, "বৌমা, মৈত্রেয়ী লিখেছিল ওর ওখানে যেতে কিন্তু সেখানে যেতে সাহস হোলো না, আমি এখানেই এলুম। ডাক্তাররা বলছেন আমার কখন্ কী হয় তাই তোমাদের কাছাকাছি থাকাই ভালো। আমাকে এবার বড়ো ক্লান্ত করেছে, ভিতরে-ভিতরে দুর্বল বোধ করছি, মনে হচ্ছে যেন সামনে একটা বিপদ অপেক্ষা ক'রে আছে।" এমন সময় বনমালী তাঁর স্নানের খবর দিয়ে গেল তাই তখনকার মতো কথাবার্তা ভঙ্গ করে সকলে উঠে পড়লেন। আমি সুধাকান্তকে একলা পেয়ে বললুম, "তুমি কোন্ সাহসে এই পাহাড়ে-রাস্তায় বাবামশায়কে নিয়ে এলে, দরকার

হোলে আমাকে লিখলে আমি না হয় চলে যেতুম।” ইদানীং আমি কিংবা আমার স্বামী কাছে না থাকলে উনি ভারি বিচলিত হতেন। সুধাকান্ত বললে, “বৌদি, উপায় কী আছে, উনি জেদ ধরলেন এখানে আসবেন, কিছুতেই ছাড়লেন না, থামাবার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, এমন কি ডাঃ রায়[১] সুদ্ধ বললেন, ‘আপনার শহরের কাছ থেকে দূরে যাওয়া উচিত নয়, যেখানে ডাক্তার সহজে পাওয়া যায় এমন জায়গার কাছাকাছি আপনার থাকা দরকার,’ এই শুনে গুরুদেব বললেন, ‘আচ্ছা মংপু যাব না কিন্তু কালিম্পঙে যেতে তো বাধা নেই, সেটা তো আর গতিবিধির বাইরে নয়।’ তাঁর এখানে আসবার এত বেশি আগ্রহ দেখে আমরা বাধা দিতে সাহস করিনি।”

আমার স্বামী এই সময় জমিদারি পরিদর্শনের জন্য পতিসরে গিয়েছিলেন। তিনিই একমাত্র লোক যিনি বাবামশায়কে নিবৃত্ত করতে পারতেন। ইদানীং যদি তাঁর কোনো একটা ঝোঁক চাপত কিংবা কোনো বিষয় নিয়ে তিনি হয়তো উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তখন আর কারুর কথায় কান দিতেন না, কেবল আমার স্বামী এসে যদি বোঝাতেন তখনি শিষ্ট ছেলের মতো ঠাণ্ডা হয়ে

১. ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায়

যেতেন। এটা ছিল পরিজনবর্গের একটি আমোদের বিষয়। তবে সেই কৌতুকটি সকলে মিলে উপভোগ করতেন নেপথ্যে। গুরুদেবের সামনে যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য সকলেই রক্ষা করে চলতেন তা বলাই বাহুল্য।

সেদিন বিশ্রামের পর, পরের দিন সকালে বাবামশায়ের চেহারা বেশ সুস্থ ও তাজা দেখাচ্ছিল। আজকাল ডাক্তারের পরামর্শে আবার মাছমাংস ধরেছেন, কলকাতায় অমিতা[১] নাতবৌয়ের হাতের মাংস-রান্না অনেক দিন পরে মুখে ভালো লেগেছিল, বার-বার বললেন,—তাই পাঁঠার মাংসের ঝোল সেদিন রান্না হোলো। খাবার সময় আমাদের সকলকে সামনে ব'সে গল্প করতে হোত, সুধাকান্তও এই সময় খুব গল্প জমাত। সে বললে, "আজ বৌদি পাঁঠার মাংস রেঁধেছেন, খেয়ে দেখুন।" তিনি হেসে বললেন, "নাতবৌয়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত হবে।" কিন্তু মাংসের ঝোল শেষে বেশ সবটুকুই খেলেন। সুস্থ অবস্থায় বাবামশায় কখনো এক রান্না দুদিনের বেশি খেতেন না, নিত্য নতুন রান্না হোলে তিনি ভারি খুশী হতেন, তাছাড়া নিজেও নানা প্রকারের রন্ধন-তালিকা আমাদের বলতেন, সেই তালিকা অনুসারে

১. শ্রীঅমিতা ঠাকুর

রান্না উতরে গেলে তাঁর স্ফূর্তি হোত। অনেক সময় হেসে বলতেন, "বৌমা, তোমার শাশুড়ীকে আমি কত রান্নার মেনু জোগাতুম, আমি অনেক রান্না তাঁকে শিখিয়েছিলুম, তোমরা বিশ্বাস করবে না জানি।" বাড়ির আরো দু-একজন মেয়ে যাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁরা মজা ক'রে বলতেন, "তিনিও তো খুব ভালো রাঁধিয়ে ছিলেন, আমরা শুনেছি।" বাবামশায় হেসে বলতেন, "তা ছিলেন, নইলে আমার মেনুগুলো এত উতরত কী ক'রে।"

যাই হোক, এখন আবার মাছ-মাংস খাচ্ছেন দেখে ভালো লাগল, কেননা, খাওয়া নিয়ে নানারূপ পরখ করা ছিল ওঁর চিরকালের বাতিক, সেটা যখনি বেশি বাড়াবাড়ি মাত্রায় হোত তখনি দেখেছি শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ত। আসলে মন থেকে তাঁর ইচ্ছে হোত নিরামিষ-আহারী হোতে কিন্তু নিরামিষ খাওয়া তাঁর অভিমত হোলেও, আমিষ খেলে থাকতেন ভালো। তাঁর আহার সম্বন্ধে নিজেই আমাকে একবার একটি তালিকা লিখে পাঠিয়েছিলেন, আমি বোধ হয় তখন বোটে কলকাতায় ছিলুম :

ওঁ

কল্যানীয়াসু,

বৌমা, তোমার কাছে নালিশ করবার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছিনে। নালিশ করবার বিষয় অত্যন্ত কমে গিয়েছে। ভোরে তিনটের সময় উঠে স্নান করি, মাথায় গায়ে সরষে-বাঁটা মেখে। আলো যখন হয় চায়ের সরঞ্জাম আসে—মস্ত এক ডালা মাখন খাই চিনি সহযোগে—চীনে চায়ের সঙ্গে থাকে দু-তোস রুটি—টেবিলে যোগ দেয় সুধাকান্ত এবং সেক্রেটারি,[১] তাঁদের জন্যে রুটি ছাড়া থাকে সুনন্দা[২] কোম্পানির রচিত মিষ্টান্ন—সেটাতে আমার অতিথিদের যথেষ্ট উৎসাহ দেখতে পাইনে,—নিশ্চয় সকালে তাঁদের যথেষ্ট খিদে থাকে না। বেলা সাড়ে দশটার সময় আমার মাধ্যভোজন—একেবারে বিশুদ্ধ হবিষ্যান্ন আতপ চালের সফেন ভাত, আলুসিদ্ধ, কচুসিদ্ধ, কোনো-কোনো দিন অতি সভয়ে খেয়ে থাকি তোমারই বাগানে উৎপন্ন ওল-সিদ্ধ। সঙ্গে থাকে এক পাইন্ট ঘোল। তিনটের সময় বাগানের আতা এবং আঙুরের রস। ছ'টার সময় ভুষি সমেত আটার দুই খণ্ড রুটি, সিদ্ধ আলু ভাজা সংযোগে, এক পেয়ালা দুধে কিঞ্চিৎ ফলের রস মিশিয়ে। এর অতিরিক্ত যা-কিছু আসে সে আসে ঠাকুরের নৈবেদ্যরূপে, ঠাকুরের প্রসাদরূপে সে যায় অন্যের ভোগে।

কার্তিক মাসের আরম্ভ থেকে ক্রমশই ঠাণ্ডা পড়ছে, কাল পরশু মেঘ করে ছিল, বৃষ্টি ফাঁকি দিয়েই অন্তর্ধান করেছে—আজ স্নিগ্ধ হাওয়া দিচ্ছে। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা চারিদিকেই, কিন্তু গরমের প্রতাপ

১. শ্রীঅনিলকুমার চন্দ ২. শ্রীসুনন্দা দেবী

আর টেঁকে না। লুঙি জামার উপর একখানা ঢিলে কাপড় চড়িয়েছি।

তুমি কবে এসে আমাদের ভার গ্রহণ করবে সেজন্যে তাকিয়ে আছি। ইতি ২২ অক্টোবর, ১৯৩৫

বাবামশায়

আজকাল বিকেলে চায়ের পর গৌরীপুর-ভবনের লম্বা বারাণ্ডায় আমার হাত ধরে বেড়ান, বলেন, "বৌমা, আমার একটু বেড়ানো দরকার, বসে থেকে-থেকে আমার পা-গুলো অসাড় হয়ে আসছে।" আমি ভাবছি, মাত্র এক সপ্তাহ এসেছেন, এখনি এতটা যখন ভালো বোধ করছেন, তাহলে বোধ হয় ঠাণ্ডাতে ভালোই থাকবেন। সমস্ত দিন লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, বিকেলে চায়ের পর সকলের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন, কালিম্পঙে পৌঁছবার ছুদিন পরে সুধাকান্তকে ডেকে বললেন, "তুই যা শান্তিনিকেতনে, তোর ছেলের অসুখ করেছে, তার কাছে তোর থাকা দরকার, এখানে আলু একা থাকলেই ফাই-ফরমাশের কাজ বেশ চলে যাবে। অমিয়কেও[১] আসতে লিখে দেব, সে যদি আসতে পারে তো বেশ হবে। এদিকে মৈত্রেয়ীরও আসবার কথা আছে।" বাবামশায়ের আদেশ অনুসারে সুধাকান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার পরদিন চলে গেল।

১. ডাঃ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

এদিকে আবহাওয়া বদলে গেছে, বর্ষার শেষ রেশটুকুও এখন আর মেঘেতে নেই, আকাশে বাতাসে ঝলমল করছে উজ্জ্বলতা, ঘন নীলাম্বরী গুণ্ঠন খুলে পৃথিবী হালকা হাওয়ার শাড়ি পরেছে। তিব্বত থেকে বইছে শীতের পূর্বদূতী ঈষৎ শিরশিরে হাওয়া। দিনগুলো ভ'রে ছিল আলোবাতাসের উৎসব। বাবামশায় আকণ্ঠ পুরে পান করছেন তার আনন্দ।

২৫ সেপ্টেম্বর। সকালে উঠে দেখলুম, সমস্ত জানালাদরজা খুলে দিয়ে বসে আছেন, একটু দূরে বনমালী চায়ের আয়োজন করছে, দূরে উদয়াচলের খোলা দ্বার দিয়ে দেখা যাচ্ছে ধবল শিখরের উদার ঋজু দেহ, সেই অসীম স্তব্ধতার আবরণ ভেদ ক'রে বাতায়নপথে ধ্যাননতলোচন কবির শুভ্র কেশ ও কপালের উপর এসে পড়েছে শঙ্করের প্রথম আলোক-আশিস, আর গায়ের উপর দিয়ে বইছে নবপ্রভাতের বিশ্বব্যাপী মধুর স্পর্শ। নিচের বাগানে লেগেছে নানা রঙে ও গন্ধে মিলে লতাপাতার হুল্লোড়, কবির প্রাণ আর তাদের প্রাণ আজ এক হয়ে গেছে।

আমি বনমালীকে ডেকে আস্তে-আস্তে বললুম, "এত সকালে ঠাণ্ডায় জানালা খুলে দিয়েছিস, করেছিস কী, ঠাণ্ডা লাগবে যে।" বনমালী বললে, "বাবামশায়ের হুকুম, না খুললে রাগ করবেন।"

যখন চা খাবার জন্যে উঠে এলেন, বললুম, "বাবামশায়, নূতন ঠাণ্ডা, এখানে আপনি একটা গরম জোব্বা পরুন, কেবলমাত্র আলোয়ান এখানকার পক্ষে যথেষ্ট নয়।" বাবামশায় হেসে বললেন, "তোমরা বড়ো শীতকাতুরে, এ কি আবার ঠাণ্ডা।" তার পর চা খাওয়া শেষ করে লেখবার ঘরে গিয়ে বসলেন, লিখলেন:

পাহাড়ের নীল আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনী মৌমাছি,
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দে করতালি।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ॥—জন্মদিনে, ১৪

এতদিন তাঁর দেহমন দিয়ে যা শোষণ করেছিলেন আজ তাঁর ছন্দে তাই দিলেন ঢেলে। আলো আর রঙের মধ্যে তিনি এ-ক'দিন সত্যিই একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ যেন কিছুদিনের নিয়ত অবসন্নতা সব ভুলে গিয়ে তাঁর মন আলোর আনন্দধারায় স্নান করছিল। তখন কে জানত এই পাঁচটা দিনই তাঁর দেহমনের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য উপভোগের শেষ কয়দিন, এরি পিছনে আকীর্ণ ক'রে আছে

অন্ধকার রাতের সংকল্প। অনেকদিনের ক্লান্তিভরা বিষণ্ণ ছায়া অপসারণ ক'রে যেন হঠাৎ উদ্দীপ্ত হোলো একটি আবেগময় প্রাণের আনন্দ মুহূর্ত, তারি শিহরনে গাইলেন :

আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ।

২৪ সেপ্টেম্বরেও কালিম্পঙে যে কবিতা লিখেছেন তার থেকে বোঝা যায় সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলে তিনি ঐ সময়ে একটি ধ্বনি ও ভঙ্গীর আনন্দলোকে বিচরণ করছিলেন :

উদ্দাম হইয়া উঠে শুধু ধ্বনি শুধু ভঙ্গী তার।
মনে মনে দেখিতেছি সারা বেলা ধরি'
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন করি',
আকাশে আকাশে যেন বাজে
আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।—জন্মদিনে, ২০

তাঁর জীবনের বিষাদপূর্ণ অধ্যায় শুরু হবার কয়েক-দিন আগে তিনি যে চিন্ময়লোকে বাস করছিলেন তাঁর সেই অনুভূতি এই ক'দিনের লেখার মধ্যে বাঁধা পড়েছে। সমস্ত সৃজনীশক্তি যেন শেষ উদ্দামতায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, তাই ধ্বনি ও ভঙ্গীগুলো তাঁর মানস-আকাশে সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় পাখা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যাকে

কোনো নাম দেওয়া যায় না, তাকেই তিনি বলেছেন, "আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।"

২৫ সেপ্টেম্বর দুপুর দুটোর সময় অমিয়বাবুকে নিমন্ত্রণ ক'রে এক চিঠি লিখলেন, চিঠি শেষ ক'রে আমাকে ডেকে বললেন, "অমিয়কে এখানে আসতে লিখলুম বৌমা। তুমি কর্ত্রী, তোমার মতটা নেওয়া দরকার।" তিনি প্রায় মজা ক'রে আমাকে এই রকম বলতেন যদিও তিনি জানতেন তাঁর ইচ্ছাই সব, তবু আমার প্রতি এই স্নেহের সম্মান-দান তাঁর মতো শিল্পীর সূক্ষ্ম মনের প্রীতিপূর্ণ পরিচয় ব'লেই জানতুম। আমি হেসে বললুম, "বেশ হবে, অমিয়বাবু এলে আপনার ভালো লাগবে।" বাবামশায় সায় পেয়ে ভারি আনন্দিত হলেন। সেদিন বিকেলে বললেন, "আজ সকালে খাওয়া গুরুপাক হয়েছে, বেশি কিছু বিকেলে খাব না।" অতি অল্পই খেলেন। আজকাল খাওয়া-সম্বন্ধে বাবামশায়কে খুব সাবধানে থাকতে হয়। এমন সময় মংপু থেকে চিঠি এল, কাল সকালে মৈত্রেয়ী গৌরীপুর-ভবনে পৌঁছবেন। বাবামশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, সন্ধ্যার সময় বললেন, "তাই তো মাংপবী আসছে, আর, আজ শরীরটা খারাপ হোলো, আজ রাতে ওষুধটা বৌমা খাব, তাহলে কাল

শরীর ঠিক হয়ে যাবে।" তাঁর পা ফুলত ব'লে ডাক্তার বলেছিলেন, মালিশ দরকার, তাই শোবার আগে তেল দিয়ে মালিশ করে দেওয়া হোত। সেদিন রাত ন'টার সময় সোফার উপর শুয়েছেন, আমি পায়ে মালিশ করে দিলুম ; ঘর অন্ধকার ছিল, বুঝলুম তাঁর তন্দ্রার মতো এসেছে, তাই অতি সন্তর্পণে উঠলুম যাতে তাঁর তন্দ্রা না ভাঙে। কিন্তু ওঠার শব্দেই বোধ হয় সে-ঘুমটুকু কেটে গেল। আমাকে ডেকে বললেন, "বৌমা, আমি এইবার শুতে যাই, তুমি বায়োকেমিক ওষুধগুলো রাতের মতো আমার টেবিলে রেখে যেয়ো।" তিনি শুয়ে পড়লেন। আমি ওষুধ আদেশমতো টেবিলে রেখে মশারি গুঁজে চলে এলুম। আমার শোবার ঘর বারাণ্ডার অপর প্রান্তে, বেশি দূর নয়, বনমালীকে বলে এলুম, "বাবামশায় যদি রাতে ওঠেন, আমাকে ডাকিস।" বনমালী শুত তাঁর শোবার ঘরের দরজায়। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কিসের শব্দে জানি না, বুঝলুম, বনমালী উঠেছে, বাবামশায়ের শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। সেদিন ২৬ সেপ্টেম্বর। আমি উঠে বনমালীকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কী রে, বাবামশায় কেমন আছেন।" বনমালী বললে, "না, বৌমা, ভালো ঠেকছে না, আপনি জিজ্ঞাসা করুন ঘরের মধ্যে এসে।"

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলুম, বাবামশায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন, সামনে কয়েকটা ওষুধের শিশি নিয়ে। কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করতে বললেন, "বৌমা, ভালো না," এই ব'লে তিনি আরেকটা বায়োকেমিক ওষুধ খেয়ে বিছানায় শুলেন। সকালে রোদ এসে পাছে বিশ্রামের ব্যাঘাত করে তাই পরদাগুলো টেনে দিয়ে পাশের ঘরে অপেক্ষা করে রইলুম। এদিকে দেখি বেলা সাতটা আন্দাজ বাবামশায় ধীরে-ধীরে লেখবার ঘরে এসে বসলেন হাতে কবিতার খাতা, বুঝলুম এখন একটু ভালো আছেন, পায়ের উপর মোটা কম্বল ঢাকা দিয়ে দিলুম। কবিতার খাতা নিয়ে লিখতে লাগলেন, এই সময় এক পেয়ালা গরম কফিও খেলেন। আমি বললুম, "একবার ডাক্তারকে ডাকাই।" ডাকবার অনুমতি দিলেন। অন্য সময় হোলে ডাক্তার একেবারেই পছন্দ করতেন না, আজ আর কোনো আপত্তি করলেন না।

দেখতে-দেখতে ঘড়িতে ন'টা, ডাক্তার গোপালবাবু[১] এলেন। দেখে শুনে বললেন, "ও কিছু নয়, একটু ওষুধ খেলেই কমে যাবে, হজমের গোলমাল মাত্র।" ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। এদিকে দেখি হর্ন বাজিয়ে মংপুর গাড়ি

১. ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র দাশগুপ্ত

এসে থামল, মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর শিশু মেয়েকে নিয়ে পৌঁছেছেন। বাবামশায় তাঁদের দেখে কত খুশী, মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখের অসুস্থ ভাব যেন মিলিয়ে গেল। মৈত্রেয়ীকে এরি মধ্যে কাছে বসিয়ে তিন চারটি কবিতা পড়ে শোনালেন। আর তাঁর নূতন লেখা গল্প ল্যাবরেটরির পাণ্ডুলিপি ওঁর হাতে দিয়ে বললেন, "বড়োই ইচ্ছে ছিল গল্পটা তোমাদের পড়ে শোনাব, বৌমাও শুনতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে আর আমার দ্বারা হোলো না, প'ড়ে নিয়ো।" আমরা বললুম "কেন, আপনি সুস্থ হয়ে কাল আমাদের শোনাবেন।" তিনি উদাসীনভাবে বললেন, "সে এখন কবে হবে।" এই সময় ওষুধ এসে পৌঁছল, তাঁকে এক দাগ ঢেলে দিলুম, তিনি খেয়ে খাটে গিয়ে শুলেন। পাশের ঘরে মৈত্রেয়ী দেবীদের খাবার প্রস্তুত, সকলেই দুপুরের আহারের জন্য চলে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই কানাইয়ের[১] অস্ফুট চীৎকারে আমি ও মৈত্রেয়ী দুজনেই ঘরের ভিতর ছুটে এলুম, এসে দেখি বাবামশায়ের মুখ লাল, আর, চেতনা যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, আমাকে মৈত্রেয়ীকে কাউকেই চিনতে পারছেন না। আমি তো চমকে গেলুম, বুঝলুম অসুখটা সহজ নয়, তখনি গাড়ি

১. বালকভৃত্য

পাঠালুম ডাক্তার আনতে। আবার ডাক্তার এলেন কিন্তু তিনিও বোধ হয় তখন আমাদের চেয়ে খুব বেশি কিছু বুঝলেন কিনা জানি না, সন্ধ্যার সময় এখানকার হাঁসপাতালের ডাক্তারকে নিয়ে আবার আসবেন ব'লে গেলেন। এদিকে সময় কাটছে একই ভাবে, কখনো একটু ভালো, কখনো একটু মন্দ; সন্ধ্যার পর যেন ভালোই মনে হোলো। দু-চারটে কথাও বলছেন, আমাদের চিনতেও পারলেন। হাঁসপাতালের ডাক্তার নিয়ে গোপালবাবু এলেন, এবার দুজনে ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, "এ তো কীডনির অসুখ চলছে, যাকে বলে য়ুরেমিয়া।" সে রাত্রের মতো তাঁরা বললেন গ্লুকোস ও ডাবের জল খাওয়াতে, সকালে এসে রুগী দেখে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন। নূতন ডাক্তারটিকে বাবামশায়ের পছন্দ হয়েছিল, মৈত্রেয়ীর দিকে চেয়ে বললেন, "ডাক্তার মানুষ ভালো।"

কথায় বলে যাকে রাখো সেই রাখে, শীতের দেশে তখন আর ডাব কোথা থেকে আসবে, তবে মনে পড়ে গেল বাবামশায়েরই সঙ্গে সপ্তাহ খানিক আগে নিচের থেকে দুটি ডাব এসেছিল, সেই দুটি ডাব এই অসময় রাত্রিতে সেদিন খুব কাজ দিল। রাত্রে ঘুম ভালো হয়নি,

কখনো শুয়েছেন কখনো বসেছেন, তবে চেতনার দিক থেকে তত আচ্ছন্ন নন, সকলকেই চিনতে পারছেন। ভোরের বেলায় একটু হর্লিক্স তৈরি করে দিলুম, খেলেন; মৈত্রেয়ীর সঙ্গে দু-একটা তামাশা করে কথাও বললেন, আমাকে বললেন, "বৌমা, তোমাদের বড়ো কষ্ট দিচ্ছি, এই মাংপবীকে খাটিয়ে নাও।"

ভাবলুম সকালে যখন ভালো তখন হয়তো আজ রোগের উপশম হবে। বেলা বাড়বার আগেই বোলপুরে টেলিফোনে খবর দেবার জন্যে আলুকে[১] আমাদের প্রতিবেশীর বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম। তাঁদের ওখানে টেলিফোন থাকায় খুব সুবিধে হয়েছিল। আলু ফিরে এসে খবর দিলে, অনিলবাবু ফোন ধরেছিলেন, আমি বলেছি গুরুদেবের শরীর অত্যন্ত খারাপ, তাঁরা যেন কেউ-না-কেউ আসেন। অনিলবাবু বললেন, তাঁরা আজই আসবার ব্যবস্থা করবেন। এদিকে গোপালবাবু সকালে যথাসময়ে এলেন কিন্তু হাঁসপাতালের ডাক্তারসাহেবের দেখা নেই। খবর নিয়ে বোঝা গেল সার্জিক্যাল কেস হাতে নিতে তিনি বড়ো ইচ্ছুক নন, বোধ হয় ভয় পেয়েছিলেন।

১. সচ্চিদানন্দ রায়

দুপুরে বারোটার মধ্যে দেখা গেল আবার বাবামশায় অচেতন হয়ে আসছেন, মৈত্রেয়ী এ-সময় থাকাতে বড়োই সুবিধা ও সাহায্য হয়েছিল। তিনি যে বাবামশায়কে কতদূর ভালোবাসেন ও ভক্তি করেন তা আমি এ-দুদিনে খুবই বুঝতে পেরেছিলুম। আজকের অবস্থা দেখে আমার মনটা যেন সাত হাত জলের নিচে নেমে পড়েছে। মৈত্রেয়ীকে বললুম, "তুমি একটু শহরে গিয়ে কলকাতায় আমাদের বিশ্বভারতী আপিসে ফোন করো এবং আমার স্বামীকেও খবর দিতে ব'লে দিয়ো যদিও তিনি এখন ঠিক কোথায় আছেন জানি না, হয়তো পতিসরের কাছে কোনো গ্রামে রয়েছেন। আরেকটি কাজ তুমি করবে, দার্জিলিং থেকে আজ রাত্রে যদি কোনো ডাক্তার আসতে পারেন তারি ব্যবস্থাও করে এসো।" মৈত্রেয়ী শহরে গিয়ে তৎপরতার সঙ্গে এই কাজগুলি সেরে এসে বললেন, "আজ রাত্রে দার্জিলিং থেকে ডাক্তার আসবার বন্দোবস্ত হয়েছে এবং কলকাতাতেও ফোন করে দিয়েছি।" এদিকে সুনিশ্চিত হবার জন্যে আমি প্রশান্তচন্দ্রকে[১] আমাদের পাশের বাড়ি থেকে ফোন করে দিলুম যাতে কালকে সকালের মধ্যে ডাক্তার নিয়ে কেউ-না-কেউ এখানে

১. অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

উপস্থিত হন। প্রতি মুহূর্তেই দেখছি বাবামশায় যেন কেমন হয়ে আসছেন, আমরা কেউ কিছুই করতে পারছি না, জ্বরও উঠেছে দুপুর থেকে একশ-দুই, তাঁকে নিয়ে বসে আছি কখন্ দার্জিলিঙের ডাক্তার আসবেন সেই আশায়। সন্ধ্যার দিকে আর তাঁর কোনো জ্ঞান আছে ব'লে মনে হচ্ছিল না।

রাত্রি আটটায় দার্জিলিং থেকে ডাক্তার এসে পৌঁছলেন, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া একজন সাহেব। যা বলবার মৈত্রেয়ী তাঁর সঙ্গে কথা কইছিলেন, কথা কইবার মতো অবস্থা তখন আমার ছিল না। তিনি এসেই বললেন,"ইনিই কি ডক্টর টেগর।" তার পর ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্র হাতে বেঁধে ঘড়ি দেখতে লাগলেন, বললেন, "ব্লাড-প্রেসার খুব ভালো", হার্ট পরীক্ষা করবার সময় পাঞ্জাবির বোতাম খুলে দিতে বাবামশায়ের লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ দেহ দেখে ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে ব'লে উঠলেন, "ডাক্তার ঠাকুরের শরীরও কী সুন্দর। What a body Dr. Tagore has !" পরীক্ষা শেষ ক'রে ডাক্তার অন্য ঘরে গেলেন। আমি মৈত্রেয়ীকে ওঁর সঙ্গে যেতে বললুম, অভিমত জানবার জন্যে। খানিকক্ষণ পরে মৈত্রেয়ী ফিরে এসে বললেন, "প্রতিমাদি, আপনি যান,

ডাক্তার কী বলছেন শুনুন গিয়ে।” আমি বললুম, “কী ব্যাপার।” মৈত্রেয়ী বললেন, “ডাক্তার আজই রাত্রে অপারেশন করতে চান্‌, আপনার মত চাইছেন, বলছেন, ‘আজ রাতে অপারেশন না হোলে ওঁর জীবন-সংশয় হোতে পারে।’ ডাক্তারের মতে ওঁর য়ুরিনিমিয়া হয়েছে তাই ভিতরে-ভিতরে বিষক্রিয়া হওয়ার দরুন উনি অচেতন হয়ে আছেন।” ডাক্তার গোপালবাবুও ঘরের ভিতরে এসে আমাকে এই কথাই বললেন যে, ডাক্তার আমার মত পেলে আজ রাত্রেই অপারেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন। এখন কী করা কর্তব্য, আমার মতের উপরেই সব নির্ভর করছে। ভগবান আমাকে এ কী পরীক্ষার মুখে ফেললেন। আমি মন স্থির করে বাবামশায়ের অচৈতন্য দেহের পাশে দাঁড়িয়ে একবার নিজের মধ্যে চিন্তা করে দেখলুম। কিন্তু আমার বিবেকবুদ্ধি অপারেশনের পক্ষে কিছুতেই সায় দিল না; তা ছাড়া এটা আমি ভালো করেই জানতুম, এই মুহূর্তে বাবামশায়ের যদি একটুখানিও চেতনা থাকত তাহলে তিনি কখনোই অপারেশনে মত দিতেন না। এটুকু আমার খুব সত্য করেই জানা ছিল ব’লে, সেই ধারণার উপর নির্ভর ক’রে আমি আরো মনে জোর পেলুম। ডাক্তারকে গিয়ে বললুম, “আজ রাত্রে অপারেশন হোতে পারে না।

প্রথমত, আমার স্বামী এখানে উপস্থিত নেই ; দ্বিতীয়ত, কলকাতার যে-সব ডাক্তারেরা কবিকে দেখে থাকেন তাঁরা কাল সকালে এখানে পৌঁছবেন, তাঁদের জন্য অপেক্ষা না ক'রে আজ রাত্রে অপারেশনে মত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" ডাক্তার এই রকম পাল্লায় বোধ হয় কখনোই পড়েননি ; ভাবলেন, বাঙালী মেয়েকে ভয় দেখালেই সব ঠিক হয়ে যাবে ; বললেন, "আপনি বারো ঘণ্টার জন্য বিপদ-সম্ভাবনা কাঁধে নিচ্ছেন, জানেন না, কাল কী ঘটতে পারে। Do you know Mrs. Tagore, you are taking the risk of 12 hours, you don't know what may happen to-morrow." কথাটা অত্যন্ত ভয়াবহ, মনটা কেমন চমকে উঠল, তার পরমুহূর্তে কেমন একটা বিশ্বাস গুঁড়ি মেরে যেন মনের মধ্যে সাহস জাগিয়ে বললে, না না, ডাক্তারের কথায় বিশ্বাস করে কাজ নেই। বাবামশায়ের ভবিতব্য কখনো এইভাবে শেষ হোতে পারে না, তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি আছে তা এত সহজে নিঃশেষ হবার নয়। আমাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখে বোধ হয় সাহেব একটু দ'মে গেলেন, বললেন, "আচ্ছা আমি নিজেই প্রফেসর প্রশান্ত মহলানবিশকে ফোন করে দেখছি, যদি তিনি আজ

রাত্রে ডাক্তার নিয়ে যাত্রা করে থাকেন তবে মিসেস টেগরের কথা অনুসারে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো।” ডাক্তার নাছোড়বান্দা, সেইরাতেই পাশের বাড়িতে গিয়ে প্রফেসর মহলানবিশকে ফোন করলেন, উত্তরে জানতে পারলেন যে, তিনি দার্জিলিং মেলে ডাক্তার নিয়ে রওনা হয়েছেন। তখন নিরুপায় হয়ে বললেন, “যখন তাঁরা আসছেন তখন অবশ্য অপেক্ষা করাই উচিত। যদি কাল আমাকে দরকার হয় ফোন করলেই আমি আসব।” “গুডনাইট” ব'লে গাড়িতে উঠে বসলেন। আমিও তাঁকে বিদায় দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

তার পর, এখন কী করা কর্তব্য। আজ রাত্রের মতো কোনোপ্রকারে কাটিয়ে নিয়ে যেতে পারলে হয়, কিন্তু কী অসম্ভব কষ্ট পাচ্ছেন তা তো আমরা বুঝতে পারছি, কেবল মাঝে-মাঝে বলছেন, “আমার কী হোলো বলো তো।” আমাদের হাতে আছে একমাত্র হোমিওপ্যাথি ওষুধ, আমরা সে-বিষয়ে আবার কেউই খুব অভিজ্ঞ নই, তবে এখানকার একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তাঁকে বললুম, “আপনি ডাক্তার মজুমদারকে[১] কলকাতায় ফোন ক'রে, এ অবস্থায় কী

১. ডাঃ জে. এন. মজুমদার

ওষুধ দিতে পারা যায় জেনে নিন।" তিনি দ্বিধা না ক'রে ফোন করতে গেলেন। তখন রাত বারোটা হোলেও ডাক্তারকে বাড়িতে পাওয়া গিয়েছিল এই আমাদের সৌভাগ্য। তিনি ক্যানথিরিস ৩০ দু-ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে বললেন, সেই কথামতো ওষুধ চলল সমস্ত রাত। সে যেন একটা ঝড়ের রাত। নিয়তির উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছি, ঝোড়ো সমুদ্রে যে-জাহাজ ডুবু-ডুবু তারি দিকে অসীম ভরসায় তাকিয়ে, মন তখন আতঙ্কে স্তব্ধ, কেবল ভরসা হচ্ছে বাবামশায়ের অপূর্ব জীবনীশক্তি তাঁকে এই দুর্যোগের রাত পার করিয়ে দেবে। ভোরের দিকে মৈত্রেয়ীতে আমাতে অস্ফুট আনন্দধ্বনি করে উঠলুম, তাঁর চেতনা ফিরে এসেছে এবং অন্য সব লক্ষণ ভালো দেখা দিয়েছে। তিনি আমাদের চিনতে পারলেন, এ নিশ্চয় ওষুধের গুণ। কালরাত্রি শেষ হোলো, আকাশে আলো তখন ফুটে উঠছে ধীরে-ধীরে।

২৮ সেপ্টেম্বর। আশা করছি এইবার কলকাতার ডাক্তাররা এসে পড়বেন। রাত পার করে তো নিয়ে এলুম, এখন সকালের ব্যবস্থা ঠিক হওয়া চাই। হাপ্রত্যাশী হয়ে বসে আছি, প্রত্যেক ঘণ্টায় মনে হচ্ছে এইবার বুঝি সব এলেন, এই রকম দুর্ভাবনার দিন জীবনে খুবই কম

আসে। যখন আসে তখন সময়টাও যেন দীর্ঘ হয়ে দেখা দেয়। অবশেষে হর্ন যথার্থই বাজল, দেখি তিনজন ডাক্তার নিয়ে প্রশান্তচন্দ্র ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন। ডাক্তারদের মধ্যে জ্যোতিবাবু,[১] অমিয়বাবু,[২] ও সত্যসখা-বাবু[৩] এসেছেন। আর এসেছেন মীরা দেবী। আমি একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম, ডাক্তাররা এসেই তখনি বাবামশায়ের ঘরে গেলেন। ঘরে গিয়ে তাঁকে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, ওঁদের মধ্যে একজন সময় নষ্ট না ক'রে তখুনি গ্লুকোস ইন্‌জেকসন্ দিয়েছিলেন। তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে বিশেষ কিছু ভরসা পেলুম না, তবে তাঁরা এইটুকু বললেন যে, "গ্লুকোস ইন্‌জেকসনের প্রতিক্রিয়া যদি আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখি তাহলে আজই আমরা কবিকে নিয়ে কলকাতা যাত্রা করব।" কাল রাত্রে যে অপারেশন হয়নি তাতে তাঁরা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এদিকে দুপুর বারোটা আন্দাজ আরেকটা মোটর এসে পৌঁছল। তাতে সুরেনবাবু,[৪] অনিলবাবু আর সুধাকান্তবাবু এসে নামলেন, এঁরা এসেছিলেন এক্‌সপ্রেসে। এঁদের সকলকে দেখে ঠিক সমুদ্রে জাহাজ-ডুবি হবার মুখে রক্ষী জাহাজ

১. ডাঃ শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ সরকার ২. ডাঃ শ্রীঅমিয়নাথ বসু

৩. ডাঃ শ্রীসত্যসখা মৈত্র ৪. শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

এসে পড়লে আরোহীদের মনের অবস্থা যেরূপ হয় আমার সেই ভাব হোলো। ডাক্তারবাবুরা কিছুক্ষণ পরে আমাদের বললেন, "আপনারা প্রস্তুত হোন, আজই ওঁকে আমরা নিয়ে যেতে পারব।" এম্বুলেন্স প্রশান্তবাবুদের সঙ্গেই এসেছিল, প্যাক করতে বেশি দেরি হোলো না, সবই ছিল তৈরী ; এর মধ্যে আমার স্বামীর টেলিগ্রামও পেয়ে গেলুম। তিনি শিলিগুড়িতে আসছেন, পতিসরের গ্রামের মধ্যে থাকার দরুন তাঁর খবর পেতে দেরি হয়েছে, শুনলুম আগের দিন রেডিয়ো স্টেশন বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে কবির অসুস্থতার খবর আমার স্বামীর কাছে কোনো প্রকারে পৌঁছয়। আমরাও বাবামশায়কে নিয়ে কলকাতায় রওনা হলুম, মৈত্রেয়ীকে সঙ্গে আসতে অনুরোধ করায় তিনি আসতে রাজী হলেন। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা আর ঘটেনি, সবই ভালোয়-ভালোয় কেটে গিয়েছিল। তার পরদিন জোড়াসাঁকোতে পৌঁছে দোতলার পাথরের ঘরে তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হোলো। তখন তাঁর চেতনা অল্প ফিরে এসেছে, বললেন, "এ কোথায় আমাকে আনলে বৌমা।" কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলুম। "বললুম, এ যে আপনার পাথরের ঘর।" তিনি ব'লে উঠলেন, "হ্যাঁ, পাথরই বটে, কী কঠিন

বুক, একটুও গলে না।” আমি নীরবে তাকিয়ে রইলুম।

জোড়াসাঁকোয় আসবার পর আর কোনো ভাবনা ছিল না, চারিদিকে অসংখ্য পরিজন, বন্ধুবান্ধব। জন আষ্টেক ডাক্তারে মিলে একটি কমিটি তৈরি হোলো যাঁরা পরামর্শ ক'রে তাঁর চিকিৎসা চালাবেন এবং সেই সঙ্গে একটি সেবক-সেবিকা-সংঘও গঠিত হোলো। কিন্তু এই ব্যাপারটি ছিল মুশকিলের; যখন তিনি সুস্থ ছিলেন মজা করে বলতেন, “মহাত্মাজী আমার চেয়ে ভাগ্যবান, তাঁর সেবক-সেবিকার অভাব হয় না।” আজ তিনি সজাগ থাকলে বুঝতেন তিনিও কম সৌভাগ্যবান নন, তাঁরও সেবার জন্যে কত লোকে আজ লালায়িত। কিন্তু সকলের সেবা তিনি গ্রহণ করতে পারতেন না, তাঁর মনের মতো সেবক হোতে গেলে কতগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার হোত। সে-ব্যক্তির স্পর্শ হবে কোমল, থাকা চাই তার ঈষৎ ইঙ্গিতেই সব বুঝে-নেবার মতো প্রখর কল্পনাশক্তি, এবং সে হবে সদাপ্রফুল্ল, হাতের কাজে নিপুণ, উপরন্তু রহস্যালাপের সমজদার। এই সব গুণ কিছু-কিছু না থাকলে তাঁর সেবকশ্রেণীভুক্ত হওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব হোত না। তাঁর সুস্থ অবস্থায়,

শান্তিনিকেতনে এবং অন্যত্র অনেকবার দেখেছি আগ্রহ করে অনেকে পদসেবা করতে আসতেন। এমন দিন গিয়েছে, চেয়ারের পিছনে বসে দেখেছি তিনি চোখ বুজে বসে আছেন। আমি ব্যাপার দেখে মনে-মনে হাসতুম, ভাব দেখে বুঝতুম বেজায় বিপদে পড়েছেন—তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্যে তাঁদের নিরস্ত হোতে বলতে বাধছে, অথচ বুঝছি মোটেই আরাম বোধ করছেন না। খানিক পরে ব্যক্তিটি যখন নিজে থেকে উঠে যেতেন তখন আমাকে ডেকে বলতেন, "বৌমা, আমার পা একেবারে গেছে, সকলের স্পর্শ আমার গায়ের চামড়া জানি না কেন সইতে পারে না, অথচ কিছু বলতেও খারাপ লাগছিল এত আগ্রহ ক'রে উনি পা টিপে দিচ্ছিলেন।" এই রকম ব্যাপার অনেক সময়ই হোত। এ হেন ইন্দ্রিয়-বোধতীক্ষ্ণ রুগীর সেবায় খুব দক্ষতার দরকার। সেবক-সেবিকার দলের যে-কমিটি তৈরি হোলো তাতে যাঁরা রইলেন সকলেরই কিছু-না-কিছু পূর্বোক্ত গুণগুলি ছিল। যাঁরা তাঁর সেবার কাজ মাথা পেতে নিয়েছিলেন তাঁদেরই নাম রইল নিম্নোক্ত তালিকায়: নন্দিতা কৃপালিনী, অমিতা ঠাকুর, রানী মহলানবিশ, মৈত্রেয়ী সেন, শ্রীমতী ঠাকুর, রানী চন্দ, সুরেন্দ্রনাথ

কর, বিশ্বরূপ বসু, অনিলকুমার চন্দ, সুধাকান্ত রায় চৌধুরী, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, বীরেন্দ্রমোহন সেন, ইত্যাদি। সকলেই তাঁর প্রিয় শিষ্য ও অনুরক্ত ভক্ত। এঁদের হাতের সেবায় তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করতেন।

জোড়াসাঁকোয় আসবার দুদিন পরে ওয়ার্ধা থেকে শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই এলেন পূজনীয় মহাত্মাজীর বার্তা নিয়ে। সেদিন বাবামশায়ের চেতনা ফিরে এসেছে কিন্তু জীবন-আশঙ্কার কারণ তখনো দূর হয়নি। মহাদেব দেশাই অনিলকুমারের সঙ্গে বাবামশায়ের ঘরে এসে, মহাত্মাজীর সহানুভূতি, আন্তরিক'প্রেম ও প্রীতি জানালেন। অনিলকুমার জোরে-জোরে মহাদেব দেশাই মহাশয়ের বার্তা গুরুদেবকে বুঝিয়ে দিলেন, কেননা তখন তিনি ভালো করে শুনতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল, চোখের জল তাঁর এই প্রথম দেখলুম। নার্ভের উপর এত বেশি সংযম তাঁর ছিল যে, অতি বড়ো শোকেও তাঁকে কখনো বিচলিত হোতে দেখিনি, আজ যেন বাঁধ ভেঙে গেল।

এই সেবার সূত্রে দূরের বন্ধুরা অনেকে এসেছিলেন তাঁর কাছে। গুরুদেবের জীবনের শেষ বর্ষে তাঁরা ধন্য হয়েছিলেন সঙ্গ লাভ ক'রে। তিনি মেয়েদের হাতের সেবাই

পছন্দ করতেন বেশি, বলতেন, "মেয়েরা হোলো মায়ের জাত, সেবা করা ওদেরই সাজে।" যদিও ওঁর ভক্ত সেবকরা মেয়েদের চেয়ে কিছু কম করেননি এবং সুনিপুণ ভাবেই করতে পারতেন তাঁর সেবা, কিন্তু তবু বাবা-মশায়ের পক্ষপাতিত্ব ছিল মেয়েদেরই উপর, এটা মেয়েদের কম গৌরবের নয়। সেবা গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁর ভারি একটি সংকোচ ছিল, তাঁর সতত মনে হোত বুঝি তিনি সকলের উপর জুলুম করছেন। শান্তিনিকেতনে ফেরবার পর নিজের মনকে সান্ত্বনার ছলেই একদিন বলছিলেন, "মা-মণি, আমার কাছে যাঁরা আসেন তাঁদের সময় ব্যর্থ যাবে না, আমার ক্ষমতা আছে প্রতিদানের। তাঁদের অধ্যাত্মলোকে আমার শেষ স্পর্শ রেখে যেতে পারব। 'শেষ লেখা'র কবিতায় তিনি তাঁর মনের ভাব লিখে গেছেন :

আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।

... ...

দিয়েছি উজাড় করি'
যাহা কিছু আছিল দিবার

প্রতিদানে যদি কিছু পাই
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই ॥—শেষ লেখা, ১০

জোড়াসাঁকোয় বাবামশায় দু-মাস রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, কী কষ্ট পেয়েছেন চোখে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন। তাঁর এই অসুস্থতার মধ্যে পুজোর 'আনন্দবাজার' বেরল, তাতে ল্যাবরেটরি গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল, অসুখের মধ্যে সেদিন তিনি ভালো ছিলেন তাই কাগজখানি আসবামাত্র আমার স্বামী তা নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখিয়েছিলেন। কী আগ্রহ তাঁর গল্পটি দেখে, ডাক্তারদের বারণ সত্ত্বেও তিনি কাগজখানি হাতে নিয়ে আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে গেলেন। সোহিনীকে নিয়ে যখন কেউ-কেউ আলোচনা করতেন, তাঁদের প্রায়ই বলতেন, "সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায়-কালোয় মিশনো খাঁটি রিয়ালিজ্‌ম, অথচ তলায়-তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজমই হোলো সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ।" বন্ধুবান্ধব এসে গল্পটির প্রশংসা করলে অসুখের মধ্যেও তাঁর মুখ কত উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

অক্টোবর-নভেম্বর কলকাতায় কেটে গেল, এই

সময় ডাক্তারদের মধ্যে আবার আলোচনা হোতে লাগল অপারেশন হোতে পারে কিনা। কিন্তু সার নীলরতনের মত না হওয়াতে তখনকার মতো অপারেশন স্থগিত রইল। প্রথম মাস বাবামশায়ের চেতনা ঝাপসা ছিল, মাঝে-মাঝে সচেতন হতেন আবার ঝিমিয়ে পড়তেন, দ্বিতীয় মাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে পান এবং মুখে-মুখে ছড়া তৈরি করেন, কবিতা লিখতে থাকেন, সেই সময় আশেপাশে যাঁরা থাকতেন তাঁরা টুকে নিতেন সেই সব রচনা। ডাক্তারদের মতে তখনকার মতো বিপদজনক সময় কেটে গেলেও তিনি পূর্বের মতো সুস্থ হোতে পারেননি। তখন তিনি রুগী। ডাক্তাররা নভেম্বর মাসে তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। সেখানকার খোলা হাওয়া, শীতের তাজা ভাব, সমস্তই প্রথম ধাক্কায় তাঁর দেহ-মনকে সজাগ করে তুলল, মনে হোলো হয়তো একটা আরোগ্য আসবে। হয়তো আবার পূর্বের মতো চলে-ফিরে বেড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। কলকাতায় থাকার সময় শেষের দিকে যে-কবিতাগুলি লিখেছিলেন, বেশির ভাগ সেই-গুলিই 'রোগশয্যায়' নাম দিয়ে ছাপা হোলো। এই বই এবং 'আরোগ্যে'র অনেক কবিতাই

তাঁর নিষ্ঠাবান অনুরাগী সেবক-সেবিকার উদ্দেশে লেখা।

রোগের সৌভাগ্য নিয়ে তাঁর আবির্ভাব
দেখেছিনু যে-দুটি নারীর[১]
স্নিগ্ধ নিরাময় রূপে
রেখে গেনু তাদের উদ্দেশে
অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা॥
—রোগশয্যায়, উৎসর্গ

যাঁদের সেবায় দেহের অত্যন্ত ক্লিষ্টতার দিনে তাঁকে শান্তি ও স্বস্তি দিত, সেই অনুরক্তদের অন্তরাত্মাকে গভীর যান্তনার মধ্যেও তিনি নিবিড়ভাবে অনুভব করতেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই সত্য মূর্তি তাঁর কাছে ধরা পড়ত। তাঁরা নবজন্মলাভ করতেন তাঁর চেতনালোকে, সেই সব মানব-মানবীর আধ্যাত্মিক ছবি রূপায়িত হোলো 'রোগশয্যায়'-এর আবেগময় ছন্দে।

এ বিশ্বের নিত্য সুধা
করিয়াছি পান।
প্রতি মুহূর্তের ভালোবাসা
তার মাঝে হয়েছে সঞ্চিত।—রোগশয্যায়, ২৬

... ...

এ মাধুর্য করিতে সার্থক
এতখানি নির্বলের ছিল আবশ্যক।

১. শ্রীনন্দিতা কৃপালিনী ও শ্রীঅমিতা ঠাকুর

অবাক হইয়া তারে দেখি,
রোগীর দেহের মাঝে অনন্ত শিশুরে দেখেছে কি ॥

—আরোগ্য, ১৯

'আরোগ্যের' বেশির ভাগ কবিতাই শান্তিনিকেতনে লেখা হয়েছে ; কবিতাগুলির মধ্যে দেখি তিনি যেন তাঁর যাত্রার পালা আবার নব অনুভূতিতে পূর্ণ করে নিচ্ছেন, আশার বাণী আবার যেন তাঁকে উদ্দীপ্ত করে তুলছে নূতন জীবনের প্রেরণায় :

চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী
পরম আমির সাথে যুক্ত হোতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে ॥

—আরোগ্য, ৩২

শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকে বিশ্বভারতীর কর্মীরাই তাঁর সেবার কাজ শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু সেবার সমস্ত ব্যবস্থার ভার নিয়েছিলেন নিজের উপর, তাছাড়া সুধাকান্ত, অনিল, রানী চন্দ, বিশ্বরূপ,

ভদ্রা দেবী, সরোজ, তেজেশবাবু[১] সকলেই তাঁদের পিতৃতুল্য গুরুদেবকে প্রাণ ভরে সেবা করেছিলেন। আমাদের পরমকল্যাণীয়া নন্দিতা ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রধান সেবিকা। দেহসংক্রান্ত সকল বিষয়েই তাঁকে একটি ছোটো শিশুর মতো করে রাত্রিদিন লালন করতে হোত। তিনি অনেক সময় হেসে বলতেন, "আমি ছ-মাসের গ্ল্যাক্সো-বেবি হয়ে গেছি।" ডাক্তার দীননাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর কাছে সব সময় থাকতেন। প্রথম-প্রথম নূতন লোক ব'লে বাবামশায় তাঁর সেবা গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করলেও শেষের দিকে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটি সহজ হয়ে উঠেছিল।

পৌষ উৎসবের কয়েকদিন আগে ১০ ডিসেম্বর চীন থেকে এলেন মহামান্য অতিথি রাষ্ট্র-মন্ত্রী তাই-চী-তাও। রাষ্ট্রসংক্রান্ত লোকের সঙ্গে গুরুদেবের এই শেষ আলাপ-আলোচনা। অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও অতিথির অভ্যর্থনার অভিনন্দনপত্র তিনি নিজেই লিখে দিয়েছিলেন।

এদিকে ৭ই পৌষ এল, তাঁর মন এবার কত বিমর্ষ। এই প্রথম তিনি শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থেকেও মন্দিরে যোগদান করতে পারলেন না। সকালে লিখলেন :

১. শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত ॥—জন্মদিনে, ২৩

এবারকার ৭ই পৌষে এই তাঁর দান। ৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষ্যে 'আরোগ্য' নামক তাঁর গদ্য ভাষণ লেখা হয়। তার কিছু পরে 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি বই আকারে বেরল। এই সময় প্রতিদিন তিনি যুদ্ধের খবর নিতেন, কোনোদিকে কোনোপ্রকার আগ্রহের অভাব ছিল না। মনের সজীবতা রোগযন্ত্রণায় ক্ষীণ হয়নি একটুও। তিনি শুনছিলেন রোগের মধ্যেও :

আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান—জন্মদিনে, ২১

প্রতিদিন সকালে বাবামশায়কে দক্ষিণের বারাণ্ডায় বসিয়ে দেওয়া হোত, তখন কিছু-না-কিছু লিখতেন। এই সময় তাঁর মন চাইত কিছু সৃষ্টি করতে। ভোরের বেলা নাতনী নন্দিতা এসে মুখ হাত ধুইয়ে, চুল আঁচড়ে, চশমা পরিয়ে, বাইরের চৌকিতে না বসিয়ে দিলে তাঁর মনের তৃপ্তি হোত না। নাতনী-দাদামশায়ের এই মিলনটি বড়ো

মিষ্টি লাগত। তিনি কোনোদিন সেই সময়ে সকৌতুকে এই ছড়াটি নন্দিতার উদ্দেশে বলেছিলেন :

ওরে মোর দোস্ত,
আজকে সকালবেলা মেজাজটা খোস তো,
একটু সময় নিয়ে কাছে তুই বোস তো,
কেন তুই চলে যাস, করি নাই দোষ তো॥

তাঁকে কফি খাইয়ে নন্দিতা বাড়ি যেত, আসতেন রানী চন্দ। তাঁর লেখা শুরু হোত; এই সময় রানীকে তিনি ব'লে যেতেন, রানী লিখে নিতেন। সুস্থ অবস্থায় যিনি সহজে নিজের লেখা বিশেষ লোক ছাড়া সকলকে কপি করতে দিতে চাইতেন না, সে হেন লেখকের মুহুরি হওয়া রানীর কম সৌভাগ্যের কথা নয়। সকালে যা-কিছু মুখে-মুখে রচনা করতেন সুধাকান্ত বা রানী যিনি কাছে থাকতেন তিনিই টুকে নিতেন। এই সময় 'গল্পসল্প' লিখতে শুরু করেন। সুধীরবাবু[১] তাঁর বহু পুরাতন ভক্ত সেবক। কপি করে তা দেখিয়ে নিয়ে রচনার খাতাপত্র তিনি দপ্তরে রাখতেন, প্রুফের কাগজ নিয়ে সকালে রোজই মাথা নিচু করে এসে দাঁড়াতেন, মাঝে-মাঝে প্রুফ দেখাবার সময় ধমক খেতেন কিন্তু তাঁর সলজ্জ দৃষ্টি কখনো মাটির থেকে

১. শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

মুখের দিকে উঠতে দেখিনি। এক-একদিন বাবামশায় অধৈর্য হয়ে বলতেন, "বাঙালের জেদের শেষ নেই।" "বাঙাল যখন আসে মোর গৃহদ্বারে, নূতন লেখার দাবি নিয়ে বারে বারে'—'দেশ' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই কবিতাটি এঁরই উদ্দেশে লেখা। আর-একটিতেও তিনি লিখেছেন :

নাকের ডগা ঘসিয়া হাসে
দেয় না পষ্ট জবাব বাঙাল,
কাজ করে সে ষোলো আনার,
খাতা এবং ছাপাখানার
মাঝখানে সে বাঁধে জাঙাল ॥

'গল্পসল্পে'র গল্পগুলি সাহিত্যের এক অভাবনীয় সৃষ্টি। এর মধ্যে তাঁর অসুস্থ শরীরের অবসাদপূর্ণ মনের চিহ্ন কিছুমাত্র নেই। যে-চরিত্রগুলি তিনি ছেলেবেলায় দেখেছেন, মানুষ হয়েছেন যাঁদের সঙ্গ-রস নিয়ে, গল্পের নায়ক-নায়িকাগুলি তাঁদেরি ছায়া,—কবির মানস-নিকেতন থেকে বেরিয়ে এসেছে, তাই তারা এত জীবন্ত। মানুষগুলি পার্থিব জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে অনেকদিন, কিন্তু কবির মনোলোকে তারা অমর।

নভেম্বর মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত তিনি রুগ্ন ছিলেন।

পূর্বের শক্তি তখনো ফিরে পাননি কিন্তু তবু মনে হোত ধীরে-ধীরে ভালো হবেন, মাঝে-মাঝে ব্যামো কমবেশি হোত, জ্বরও বাড়ত কমত, তবুও মোটের উপর শীতকাল ভালোই কাটল।

যদিও ৯৯ ডিগ্রি জ্বর রোজই প্রায় আসত, তাহলেও সেটা তাঁকে বলা হোত না, পাছে তিনি দ'মে যান, কেননা এই সময় তাঁর মনে একটু আশার ছায়া দেখা দিয়েছিল। ডাক্তাররা তাঁকে সাধারণত বলতেন সকালে ৯৭ আর বিকেলে ৯৮ ডিগ্রি। তাঁর কাছে এই ছিল ম্যাকসিমাম টেমপারেচার। রোগের গ্লানি শরীরে খুবই থাকত কিন্তু তবু কেউ দেখা করতে এলে সৌজন্য এবং হাস্যালাপের ব্যাঘাত হোত না। তাঁর অনুচরদের সঙ্গে হাস্যকৌতুক ক'রে গৃহকে উজ্জ্বল করে রাখতেন, রুগীর ঘর ব'লে একটুও মনে হোত না। তিনি এই সময় সেবাগৃহের জন্য বিশেষ একটি ভাষাও তৈরি করেছিলেন। সে-সব কথাগুলির মানে তাঁর অনুচরবর্গ সকলে বুঝে নিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের অন্যতম বিশেষত্ব কৌতুকপ্রিয়তা তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে এসেছিলেন; জীবনের অন্ধকার দিনেও প্রাণ খুলে হাসতে পারতেন।

এই নয় মাসে ধীরে-ধীরে চেহারা বদলে গিয়েছিল,

তিনি শীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু তাতে তাঁকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখাত না, তাঁর চোখের উজ্জ্বলতা একটি করুণায় পূর্ণ হয়েছিল, তাঁকে ইদানীং মনে হোত তপঃক্লিষ্ট ঋষি, আধ্যাত্মিক জ্যোতির মধ্যে দিয়ে চলেছেন মহাপ্রস্থানের পথে, মুখে ঠিকরে পড়ত একটি প্রীতি ও শান্তির ধারা। বড়ো চুল আর রাখতে চাইতেন না ব'লে রুপোলী কেশগুচ্ছ কেটে দিতে হয়েছিল, চুল ছাটাতে প্রশস্ত কপালের গঠন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, নাসার উপর দিয়ে অর্ধাস্যের রেখায় দার্শনিকের ছবি ফুটিয়ে তুলত। রোগশয্যায় কবির চেয়ে তাঁকে আজকাল একজন সাধক দার্শনিক ব'লেই মনে হোত।

তাঁর তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়বোধ তখন ধীরে-ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে, কানে খুবই কম শুনতে পেতেন, চেঁচিয়ে কথা বলতে হোত। দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল, অতি ধীরে একটি-একটি ক'রে অক্ষর লিখতেন। তিনি একটু আনন্দ পাবেন ব'লে অনেক সময় শান্তিরা[১] গান শোনাতে আসতেন কিন্তু সকল সুর আর তাঁর কানে পৌঁছত না, তাই তিনি গান শেষ হোলে গভীর নৈরাশ্যের সুরে বলতেন, "আমার কানে সুরের সব নোট স্পর্শ করে

১. শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

না।” যে-সুর মদের মতো একদিন দেখেছি তাঁর মাথায় উত্তেজনা আনত আজ তা’র থেকেও তিনি বঞ্চিত, যে-কলম ছিল তাঁর সৃষ্টি-কাজের অব্যর্থ যন্ত্র, তাতেও আজ তাঁর দাবি নেই, অন্যের সাহায্য নিতে হয়।

একদিন তিনি লিখেছিলেন :

হার মানালে গো, ভাঙিলে অভিমান

ভগবান কি তাঁকে এমনি ক’রেই হার মানিয়ে তবে কোলে নেবেন। কী নিষ্ঠুর সেই দেবতা যাঁর এই বিধান।

এদিকে শীতের জের কমে এসেছে, চারিদিকে ঝরা পাতার খস খস আওয়াজ যেন বসন্তের পদক্ষেপের মতো শোনায়, শিমুল ও পলাশের মধ্যে উঁকি মারছে ফাল্গুনের আগুন। দোল-উৎসবের আয়োজন শুরু হয়েছে। বাবামশায় ফাল্গুন পড়তেই খোঁজ নিচ্ছেন ব্যবস্থা সব ঠিক হয়েছে কিনা। কিছুরই ত্রুটি হোলে চলবে না, যেমন নাচ-গান-অভিনয় উৎসব হয়ে থাকে তেমনি হবে। আমাদের বললেন, “তোমরা কিছু করো, ‘নটীর পূজা’র রিহার্সাল আরম্ভ করে দাও। কিছু করা চাই নইলে শান্তিনিকেতনের জীবন ঝিমিয়ে পড়বে যে।” নিজেই শৈলজাবাবু[১] ও শান্তিকে ডেকে গান বেছে দিলেন।

১. শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

'নটীর পূজা' তাঁর আদেশে রিহার্সাল দিয়ে তৈরি করা হোলে সর্বসমক্ষে উৎসবের দিনে অভিনীত হবার আগে তাঁর সামনে নিরালায় একদিন অভিনয় হোলো। তিনি দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

সকালে আমবাগানে দোলের দিনে হোলো নৃত্যগীত ও কবিতাপাঠ। তাঁর কাছে সমস্ত খবরই পৌঁছত, তিনি আগ্রহ করে শুনতেন সব। এবারকার বসন্তের কবিতার মধ্যে একটি বিদায়ের করুণ সুর বাজতে লাগল, কতবার ফাল্গুন এসেছে মিলনের বাণী বহন ক'রে তাঁর জীবনে, এবারের মিলন-পাত্রের তলায় রইল বিচ্ছেদের বুদবুদ, পথের হাওয়ার ইঙ্গিতে প্রাণ তাঁর গাইল :

এ বৎসর বৃথা হোলো পলাশবনের নিমন্ত্রণ।
মনে করি গান গাই বসন্তবাহারে।
আসন্ন বিরহ স্বপ্ন ঘনাইয়া নেমে আসে মনে।

—জন্মদিনে, ৪

১৩৪৭ সনের ফাল্গুন মাস চলে গেল, দেখতে-দেখতে এসে পড়ল ১লা বৈশাখ। শুরু হোলো ১৩৪৮ সন, ইতিহাসের একটি স্মরণীয় বৎসর। এই নববর্ষের তাৎপর্য তখন কেউ বুঝিনি, কিন্তু কবির মনে ভবিষ্যতের একটি নিবিড় স্পর্শ এসে পৌঁছেছিল, তাই লিখেছিলেন :

দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।

...   ...

আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে।—জন্মদিনে, ১

এই দিনে তিনি দিয়ে গেলেন মানুষকে 'সভ্যতার সংকট' অভিভাষণ, তার জোরালো ভাষা তখন আমাদের দেশবাসীকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। তাঁর 'জন্মদিনে' বইখানি বেরল, সকালে তাঁর হাতে দেওয়া হোলো। তিনি এই শুভজন্মতিথিতে দেশকে ও মানুষকে শেষ উপহার দিলেন, এই কবিতাগুলি তাঁর জীবনযজ্ঞের আহুতির শিখা, অনেক দুঃখের তপস্যার ফল। এর পাতায়-পাতায় রয়েছে তাঁর শেষ বর্ষের ইতিহাস।

এখানে "জন্মদিনে" থেকে একটি কবিতার উল্লেখ না ক'রে পারলুম না :

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি

—জন্মদিনে, ১০

মনের মধ্যে আনন্দের মধুচক্র ছিল ব'লেই কবির প্রাণের বাঁশিতে লেগেছিল সকল ভাবের আঘাত, তারি

প্রকাশ জেগে উঠেছিল 'নব নব রূপে।' তবু অতৃপ্ত মন তাঁর ব'লে উঠল :

এই স্বরসাধনায় পৌছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।—জন্মদিনে, ১০

প্রকৃতির এমন একটি কোণও ছিল না যার গোপন রহস্য এই আশ্চর্য জাদুকরের চোখ এড়িয়ে যেত, তাঁর দৃষ্টিশক্তির অদ্ভুত ক্ষমতা আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। এত পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর মরমী মন তৃপ্ত হয়নি, সেই অতৃপ্তিই স্রষ্টার অন্তর্নিহিত গৌরবময় সৃষ্টিশক্তিকে পিছন থেকে প্রেরণার খোরাক জোগাত বারংবার। যাত্রা-বেলায়ও তিনি ডেকে ব'লে গেলেন,—মানুষকে জানা তাঁর শেষ হোলো না :

সব চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।—জন্মদিনে, ১০

বিচিত্র সম্পদপূর্ণ কীর্তিও তাঁর মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারল না, 'নির্বাক মনের' 'অখ্যাত জন'-সাধারণের জন্য

প্রাণ রইল তাঁর ফাঁকা। সাধারণ মানুষের পার্থিব সুখদুঃখময় জীবনযাত্রার মধ্যে না-পৌঁছতে পারার সন্দেহ তাঁকে কেবলি পীড়া দিয়েছে। তাঁর অতৃপ্ত মনের বেদনা তাকিয়ে রইল ভাবীকালের প্রতীক্ষায়। তাঁর যুগ-প্রান্তিক থেকে যে-গুণীর আবির্ভাব হবে তুলে নিতে তাঁর কণ্ঠের "না-বলা-বাণীর" সুর, সেই সূত্রধারের উদ্দেশে তিনি রেখে গেলেন তাঁর এই শেষ প্রশস্তি :

সাহিত্যের ঐকতান সংগীত সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়,
মূক যাঁরা দুঃখে সুখে
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি,
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার ॥—জন্মদিনে, ১০

বইখানি তাঁর রোগশয্যার মানসিক দর্পণ। তিনি তাঁর জয়যাত্রার আয়োজন যেন ভরে নিয়েছেন গভীর অনুভূতির চরম দেখায়। যে-জীবনদেবতার ধ্যান প্রথম বয়সে

তাঁর মনে নিবিড় হয়েছিল, কালে-কালে তাই মহামানবের বিরাট অনুভবে এসে মিলিত হোলো।

তাঁকে সামনে বসিয়ে জন্মদিনের উৎসব যে আর হবে না তখন তা কে জানত, কিন্তু এবারকার আয়োজনটি হয়েছিল সুন্দর, কত বন্ধু তাঁর কত জিনিস পাঠালেন, ফলে ফুলে ঘর ভরতি হয়ে গেল, বিশেষ ক'রে আমের সাজিতে; এই ফলটি ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। গত বৎসরেও দিনে ছ-সাতটা ক'রে আম খেতেন, এবার এত ভক্ত তাঁকে আম পাঠাচ্ছেন কত দেশদেশান্তর থেকে কিন্তু খাবার স্পৃহা চলে গেছে, অনেক অনুরোধ করলে তবে চামচে করে একটু মুখে দিতেন। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর নাতনী তাঁকে জন্মদিনের সাজে সাজিয়ে দিল শুভ্র গরদের ধুতি উত্তরীয় মাল্যচন্দনে। ঠেলাগাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হোলো উত্তরায়ণের বারাণ্ডায় যেখানে জন্মতিথির অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রস্তুত ছিল। তিনি রুগী, কিন্তু তাঁর অন্তরের জ্যোতি সমস্ত রোগক্লিষ্টতাকে ছাপিয়ে উঠেছিল। মনে হোলো কোন্ ধ্যানলোকের দেবতা এসেছেন আজ বিশেষ পূজা নিতে।

মেয়েরা এল বিচিত্র উপহার নিয়ে শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন থেকে, সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবার সাজিয়ে দিয়েছে

তাদের নানাপ্রকারের উৎপন্ন বস্তু নূতন-নূতন রচনায়। হৃদয় দিয়ে শিল্পীরা গড়েছে তাঁর শেষ জন্মদিনের উপহার। সার বেঁধে বাসন্তী কাপড় প'রে মেয়েরা যখন নিয়ে এল তাঁর পায়ের কাছে নিবেদনের ডালা, তখন অজানা ছিল যে, এ ডালা তাঁর সামনে আর সাজানো হবে না, তাঁকে নিয়ে এই তাঁর শেষ জন্মদিন। কিন্তু তিনি মনে যেন এই অনাগত ঘটনার আভাস পেয়ে লিখেছিলেন :

জন্মদিন মৃত্যুদিন দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে-মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টি বিনিময়
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান ॥—জন্মদিনে, ২৬

নববর্ষে তিনি সেদিন যা বলেছিলেন, আশ্রমবাসীদের প্রতি এই তাঁর শেষ আশীর্বাদ :

আশ্রমবাসী কল্যাণীয়গণ, তোমরা আজ আমাকে অভিনন্দন করে উপহার বহন করে এনেছ, পরিবর্তে আমার কাছ থেকে আশীর্বাদের প্রার্থনা জানিয়েছ। প্রত্যহ নীরবে আমার আশীর্বাদ তোমাদের প্রতি ধাবিত প্রবাহিত হয়েছে, দীর্ঘকাল নিরন্তর তোমাদের অভিষিক্ত করেছে। আমার আশীর্বাদ আজ নূতন বেশে তোমাদের কাছে উপস্থিত হোক, সুন্দর বেশে তাকে তোমরা গ্রহণ করো।

জন্মকালে আমরা যে আত্মীয়লাভ করি তার মধ্যে কোনো চেষ্টা নেই, জীবনলক্ষ্মীর সে অযাচিত দান, তার মধ্যে আমাদের কোনো গৌরব নেই। তার পর জীবনযাত্রার পথে-পথে যদি আত্মীয় সংগ্রহ করতে পারি তবে সেই তো আশ্চর্য, সেই তো গৌরবের বিষয়, সেই আত্মীয়তা আরো গভীর, অকৃত্রিম, মূল্য তার অনেক বেশি—আশীর্বাদ সেই তো বহন করে আনে। আজ যে তোমাদের সকলের হৃদয়ের দান বিধাতার আশীর্বাদ রূপে আমার কাছে উপস্থিত এ এক আশ্চর্য ঘটনা। কোন্ দূরে পরিবারের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আমার বাল্যলীলা আরম্ভ, আমি কাউকে জানতুম না, দু'চারজন আত্মীয়ের মধ্যে আমার পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল। আজ তোমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ভাবি, বিধাতা আমার জীবনে কী খেলা খেললেন, সেদিন তো এ-কথা কল্পনাও করতে পারিনি। প্রচলিত ভাষায় যাকে আত্মীয় বলে তোমরা তা নও, তাই তোমাদের প্রীতি এত মূল্যবান। এই নব বৈশাখের উৎসবে তোমরা যে উপহার পুঞ্জীভূত করে এনেছ কৃতজ্ঞ অন্তরে তা গ্রহণ করি। আমার মতন সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই আছে, শুধু যে আমার স্বদেশীয়েরাই আমাকে ভালোবেসেছেন তা নয়, সুদূর দেশেরও অনেক মনস্বী তপস্বী রসিক আমাকে অজস্র আত্মীয়তা দ্বারা ধন্য করেছেন। জানি না আমার চরিত্রে কর্মে কী লক্ষ্য করেছেন। সকলের এই স্নেহমমতা সেবা আজ আমি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করি, প্রণাম করে যাই তাঁকে, যিনি আমাকে এই আশ্চর্য গৌরবের অধিকারী করেছেন।

তাঁর সার্বজনীন জন্মোৎসব নববর্ষে অনুষ্ঠিত হোলো, তা সত্ত্বেও পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠান অনাড়ম্বরে সুন্দর করেই সমাধা হোলো। উৎসবের শেষে 'বশীকরণ' অভিনয় ক'রে ছাত্র-ছাত্রীরা দেখালেন, তিনি উপভোগ করলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সেদিনের মতো উৎসব সার্থক হয়েছিল।

এদিকে গরম বেড়ে চলেছে, সন্ধ্যার সময় গরমের তাপ কমলে তাঁকে বারাণ্ডায় বসিয়ে দেওয়া হোত। সেই সময় তাঁর মাথায় অনেক-কিছু গল্পের প্লট ঘুরত এবং অনেক রকমের প্লট মুখে-মুখে বলে যেতেন আর বলতেন, "বৌমা, লেখো না।" বলতুম, "গল্প লেখা কি সহজ বাবামশায়, আমি পারব কেন।" উৎসাহ দিয়ে বলতেন, "কিছু শক্ত হবে না, আমি তোমার জন্য একটি প্লট ভেবে রাখব।" এই অসুখের মধ্যেও তাঁর সাহিত্য-জীবনের গতিরোধ হয়নি, সে নিজের আনন্দস্রোতে ভেসে চলেছিল, মাঝে-মাঝে রোগের গ্লানির বাধা পড়ত তার গতির মুখে, কিন্তু সে-বাধা ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর সৃষ্টি চলত আপন বেগে। সাহিত্যচর্চায় তাঁর বিরাম ছিল না, মুখে-মুখে হরদম কত যে মজার ছড়া তৈরি করতেন, সেগুলি সুধাকান্তবাবু অনেক সংগ্রহ করে রাখতেন।

একদিন ছুপুরে আহারাদির পর ঘুমিয়ে উঠেছেন, আমি পাশের ঘরে ছিলুম, হঠাৎ সুধাকান্ত এসে আমাকে ডাকলেন, "বৌদি, আপনার ডাক পড়েছে।" ঘুম থেকে তখনি উঠেছেন, বেলা তিনটা আন্দাজ হবে, কাছে বসতেই গল্প ব'লে যেতে লাগলেন ; বুঝলুম পূর্বে আমাকে যে-প্লট দেবেন বলেছিলেন সেটাই ব'লে যাচ্ছেন, এক টুকরো কাগজ কলম জোগাড় করে লিখে নিলুম। সেই প্লট থেকে আমূল পরিবর্তিত হয়ে উৎপত্তি হোলো 'বদনাম' গল্পের। এই রকম করেই খেলার ছলে গল্প বলতে-বলতে 'প্রগতি-সংহার' তৈরি হয়ে উঠেছিল। সকালটা তিনি ব্যস্ত থাকতেন তাঁর এই সব লেখা নিয়ে, সাহিত্যরসের স্বাদে মন উৎফুল্ল থাকত, দেখে ভালো লাগত। একদিন আবার ছুপুরে ঘুম ভাঙবার পর আমার ডাক পড়ল। আজ তাঁর শরীর কিছু সুস্থ ছিল, মনও ছিল প্রফুল্ল। আমাকে বললেন, "তুমি এই সময় এলে তোমাকে গল্প বলবার সুবিধা হয়, সকালে আমি বড়ো ক্লান্ত থাকি।" আমি দেখলুম গল্প মাথায় ঘুরছে। কাগজ-কলম নিয়ে বসলুম। দূরে সুধাকান্ত ব'সে গল্পটা উপভোগ করতে লাগলেন। আজ তাঁর মন বেশ তাজা তাই রসিয়ে গল্পটি বলতে লাগলেন, আমি তাঁর মুখের কথাগুলি

একটির পর একটি লিখে নিলুম, গল্পটি ছোটো হোলেও বেশ জোরালো আর ভাষাও তাঁর পুরাতন গল্পের ভাষার মতো প্রাচুর্যে পূর্ণ। এ গল্পটি এখনো প্রকাশিত হয়নি, ছোটো গল্প হিসাবে এটি একটি সুন্দর ছবি। তিনি গল্প লেখবার সময়টা খুবই উপভোগ করতেন বটে তবে আবার পরিশ্রম হোত ব'লে পরে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। সেইজন্য গল্পলেখা সম্বন্ধে আমরা আর বেশি উৎসাহ দিতুম না। বোধ হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে মিস র‍্যাথবোনের বিবৃতির উত্তরটি তিনি বলেন, কৃষ্ণ[১] লিখে নেন। কলকাতায় যাবার মাসখানেক আগে সবে সূত্রপাত করেছিলেন কতকগুলি ছোটো ছোটো লেখার, যেগুলি রাত্রের চিন্তা-প্রসূত টুকরো-টুকরো ভাবের ছায়াচিত্র, সকালে বলে যেতেন, রানী চন্দ বসে লিখে নিতেন। এগুলি আমার বড়ো ভালো লাগত, মনে হোত এ আর-একটি "এমিয়েলস্ জারন্যাল" তৈরি হয়ে উঠছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ জিনিস দু-তিনটি ছাড়া আর লিখে উঠতে পারেননি।

এই সময় তাঁর আঙুল আরো অসাড় হয়ে এসেছে, বর্ষা পড়ার কিছু আগে থেকেই তিনি আর কলম ধরতে

১. শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানি

পারতেন না। কোনো রকমে নাম সই করতেন। বর্ষা শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর ব্যামো ক্রমশ বাড়তে লাগল, যেটুকু ঠেকাঠুকি দিয়ে চলছিল আর যেন চলে না, বাঁধ বুঝি এইবার ভাঙল, বোধ হয় আর ঠেকানো যাবে না। এদিকে জ্বরও বেড়ে চলেছে, এখন তাঁর অনুচরেরা আর তাঁকে লুকোতে পারেন না। তিনি ঠিক বুঝতেন যে, জ্বর আসছে। এই সময় একদিন বিকেলে বললেন, "মা-মণি, আমি ক্রমশই নেমে যাচ্ছি, বুঝতে পারছি এ ব্যামোর হাত এড়াতে পারব না। আমার নিবে-যাবার সময় এসেছে, আর কেন এই রোগযন্ত্রণা ভোগ। আমার কাজ চুকেছে। তোমরা সংসার গুছিয়ে বসেছ, আমি নিশ্চিন্ত, আর রইল এই ল্যাবরেটরি শান্তিনিকেতন, একে তোমরা বাঁচিয়ে রেখো। এর ভার রইল তোমাদেরি উপর।" চোখ জলে ঘোলা হয়ে এল, মাথা নিচু করে বসে রইলুম, বুঝলুম তাঁর যাত্রার আয়োজন তিনি শুরু করেছেন।

এই অসুখের সময় যে-চৌকিতে তিনি সব সময়ে বসতেন তার একটু ইতিহাস এখানে লিখলে বোধ হয় অবান্তর হবে না। তিনি যখন দক্ষিণ-আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে যান সেই সময় সেখানকার প্রসিদ্ধ লেখিকা ম্যাডাম

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পর[১] তিনি অতিথি হন, ইনি বাবা-মশায়ের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে বাবামশায়ের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়, তখন আমরা লণ্ডনে। সেবার নানাকারণে তাঁর সঙ্গে আমরা যেতে পারিনি, মিঃ এল্‌মহার্স্ট ওঁর সেক্রেটারি হয়ে গিয়েছিলেন। সাহেবকে বাবামশায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন, এণ্ড্রুজ-পিয়ারসনের সঙ্গে যেমন গুরুশিষ্যের সম্পর্ক ছিল, এঁর সঙ্গেও তেমনি বন্ধুভাব ছিল। সাহেব বাবামশায়কে গুরুর মতোই ভক্তি করতেন, কিন্তু সেজন্য হাসিঠাট্টার বা রহস্য-আলাপের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হোত না। বাবা-মশায় দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে ফিরে এসে আমার স্বামীকে বলেছিলেন, "দেখ্‌ রথী, আমি অনেক সেক্রেটারি পেয়েছি কিন্তু এল্‌মহার্স্টের মতো সব দিকে উপযুক্ত লোক খুব কম দেখেছি ; ও আমার এবার এত সেবা করেছে, আমাকে কিছু বলতে হোত না। ছোটো কাজ থেকে বড়ো কাজগুলি সবই নিজের হাতে করত এবং সবসময় আমার মন বুঝে এমন চলত যে, আমাকে কখনো অসুবিধেতে পড়তে হয়নি, উপরন্তু খুব আরাম পেয়েছি, ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে।"

১. কবি এঁর বাংলা নামকরণ করেছিলেন, বিজয়া। "পূরবী" কাব্যগ্রন্থটি সেই নামেই এঁকে উৎসর্গ করেন।

সাহেব তখন একজন আমেরিকান ধনী মহিলার সঙ্গে বিবাহ কল্পনায় ঘুরছিলেন, শীঘ্র বিবাহ হবার কথা। বাবামশায়ের চিন্তা উপস্থিত হোলো, বিয়ে করলেই তো সাহেব চলে যাবেন ; তিনি একদিন মজা করে সাহেবকে বললেন, "তোমার বিয়েতে আমি খুশী হোতে পারছি না ; জানি, এই বিয়ে তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে।" সাহেব হেসে বললেন, "সার, আমি তো আপনার কাজের জন্যে ঐশ্বর্য এনে দেব ব'লে বিয়ে করছি।" বাবামশায় হেসে উঠলেন। এঁদের উভয়ের মধ্যে ভারি একটি হাস্য-কৌতুকের সরস সম্বন্ধ ছিল। সাহেব ঠিক আমাদের বাড়ির ছেলের মতোই হয়ে গিয়েছিলেন।

আমেরিকায় শরীর খারাপ হোতে বাবামশায় লণ্ডনে চলে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এদিকে যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করা যে সময়সাপেক্ষ সেটা তাঁর কবি-প্রকৃতিতে তিনি বুঝতে পারতেন না, দেরি হোলে অধীর হয়ে পড়তেন। তাঁর প্ল্যান আবার পরিবর্তিত হোতে কিছুমাত্র সময় লাগত না, তাঁর সঙ্গে যাঁরা বিদেশ ভ্রমণ না করেছেন তাঁরা বুঝবেন না যে, এই ভ্রমণ-ব্যাপারটা কী ছিল।

একদিন দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুরানো চিঠি পড়তে-

পড়তে একটা পংক্তি পেলুম, তাঁর ভাগনে নবীনবাবু বিলেত থেকে লিখছেন, "দেশে যে কবে ফিরতে পারব জানি না, কারণ বাবু changes his mind every minute—প্রতি মিনিটেই বাবুর মেজাজ বদলায়।"

আমি বাবামশায়কে একদিন মজা করে এই চিঠির কথা বলেছিলুম, তিনি হেসে বললেন, "আমারও ঠিক ওই জায়গায় দাদামশায়ের সঙ্গে মিল আছে।" সেই থেকে কিছু প্ল্যানের পরিবর্তন করতে হোলেই আমার দিকে চেয়ে হেসে বলতেন, "বৌমা, Babu changes his mind।"

যাই হোক, বাবামশায় দক্ষিণ-আমেরিকার গল্প প্রায়ই করতেন, "যদি বা ফেরবার জাহাজ পাওয়া গেল কিন্তু ভিক্‌টোরিয়া আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সাহেবের সঙ্গে তাঁর ছিল একটু রেষারেষির সম্পর্ক, কারণ সাহেব সর্বদা আমার কাছাকাছি থাকত, সেটা সে সইতে পারত না। অবশেষে সে ভাবলে সাহেব আমাকে নিজের স্বার্থের জন্য এত তাড়াতাড়ি ইংলণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে; গেল সাহেবের উপর খাপ্পা হয়ে। স্প্যানিসরা ভাবপ্রবণ জাত, ওদের সামলানো বড়ো কঠিন, তবে এই জাতই আবার পারে আবেগের উদ্দীপনায় আত্মোৎসর্গ

করতে। এই বিদেশিনীর মধ্যে দেখেছিলুম সেই অনুরাগের আগুন।” এই মহিলাটি তাঁর জন্যে কতদূর ত্যাগ স্বীকার করতে পারতেন তার পরিচয় পরে পাওয়া গিয়েছিল। এদিকে অনেক হাঙ্গামা করে জাহাজ তো ঠিক হোলো, ভিক্টোরিয়া cabin de luxe রিজার্ভ করে দিলেন পাছে বাবামশায়ের সমুদ্রপথে কোনো কষ্ট বা অসুবিধে হয়। তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হোতে না পেরে তাঁর নিজের ড্রইং-রুমের একখানি আরামচেয়ার জাহাজে তুলে দিলেন, এই নিয়ে জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে তাঁর আরেকবার তর্ক লাগল। কিন্তু ভিক্টোরিয়াকে কেউ পেরে উঠত না। অত বড়ো চেয়ার জাহাজের দরজায় প্রবেশ করবে না, এই ছিল ক্যাপটেনের আপত্তি, কিন্তু শেষকালে ম্যাডামেরই জয় হোলো। মিস্ত্রী ডাকিয়ে দরজা খুলে সেই চেয়ার ক্যাবিনে দেওয়া হোলো।

সেই চৌকিখানি সেবার নানাদেশ ঘুরে অবশেষে উত্তরায়ণে পৌঁছেছিল। অনেকদিন আর তিনি ওই চৌকি ব্যবহার করেননি, আমাদের কাছেই পড়ে ছিল। আজ আবার ব্যামোর মধ্যে দেখলুম ওই চৌকিখানিতে বসা তিনি পছন্দ করছেন, সমস্ত দিনই প্রায় ঘুম বা বিশ্রামান্তে ওই আসনের উপর বসে থাকতেন। কোনো একদিন

ওই কেদারায় বসে তাঁর বিদেশিনী ভক্তের কথা মনে পড়েছিল, তাই লিখেছেন :

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিব বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।
ভাষা যার জানা ছিল নাকো,
আঁখি যার কয়েছিল কথা
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা ॥—শেষ লেখা, ৫

ভিক্টোরিয়া ইংরেজি খুব ভাঙা-ভাঙা বলতেন, ফরাসী ভাষাতেই তাঁর দক্ষতা ছিল বেশি, তাঁকে সুন্দরী বলা চলে না, কিন্তু বুদ্ধির প্রখরতা তাঁর মুখে একটি সৌন্দর্যের দীপ্তি এনে দিত। তাঁর বড়ো-বড়ো কালো পল্লব-ঢাকা গাঢ় নীল চোখে একটি স্বপ্নময় আর্কষণী ক্ষমতা ছিল। তাঁর দীর্ঘ দেহ গৌরবময় আভিজাত্যের পরিচয় দিত। তিনি যখন নতজানু হয়ে বাবামশায়ের পায়ের কাছে বসতেন, মনে হোত ক্রাইস্টের পুরানো কোনো ছবির পদতলে তাঁর হিব্রু ভক্ত মহিলার নিবেদন-মূর্তি। ইনি দক্ষিণ আমেরিকার একজন স্বনামধন্য প্রভাবপূর্ণ মহিলা, এঁর বিষয় পরে আরো কিছু লেখবার ইচ্ছা রইল।

আষাঢ় মাস পড়তেই বাবামশায় খোলা আকাশে বর্ষার রূপ দেখবার জন্য উতলা হয়ে উঠলেন, তখন তাঁকে উত্তরায়ণের দোতলায় নিয়ে আসা হোলো। প্রথমটা কিছুতে আসবেন না, অনেক করে রাজী করানো গেল। এই সময় ডাক্তারদের মত নিয়ে কবিরাজী চিকিৎসা শুরু হয়েছে। কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় এই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। রানী মহলানবিশও এই সময় শান্তিনিকেতনে এসে বাবামশায়ের সেবায় যোগ দিয়েছিলেন। তাঁকে বাবামশায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তিনি এসে মাসাবধি কাছে থাকাতে অপারেশনের পূর্ববর্তী দিনগুলি গুরুদেবের কাছে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল প্রীতি ও আনন্দের পরিবেশে। রানীর গল্প শুনতে তিনি ভালোবাসতেন এবং তাঁকে কাছে বসিয়ে হাস্যালাপ করে প্রফুল্ল হয়ে উঠতেন।

এমন সময় এক দিনের জন্য কলকাতা থেকে ইন্দুবাবু[১], বিধানবাবু ও ললিতবাবু[২] এলেন, সঙ্গে ছিলেন জ্যোতিবাবু। তাঁরা ওঁকে দেখে-শুনে পরীক্ষা করে স্থির করলেন, শ্রাবণমাসেই অপারেশন হবে। ডাক্তার রাম অধিকারী, জিতেন্দ্র দত্ত এবং সত্যেন্দ্র রায় মহাশয়গণও কয়েক দিন

১. ডাঃ শ্রীইন্দুভূষণ বসু ২. ডাঃ শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পরে এসেছিলেন। অপারেশন সম্বন্ধে সকলেই একমত হন। এঁরা তখন গুরুদেবকে দেখবার জন্য ঘন-ঘন যাতায়াত করতেন।

বাবামশায়ের মনে-মনে তাঁর অবসানের একটি কাল্পনিক ছবি গড়ে উঠেছিল, সেই ভাবের কথাও তিনি বলতেন। যেমন ক'রে ফুলপাতা খ'সে পড়ে, বৃদ্ধগাছটি যেমন ক'রে ধীরে-ধীরে শুকিয়ে আসে, তিনি ভেবেছিলেন তেমনি ক'রে একদিন প্রকৃতির কোলে ঝরে পড়বেন। সেই হোত কবির যথার্থ স্বাভাবিক অবসান :

> আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন
> শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
> ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি
> আপনারে দিতেছে বিস্তারি
> আমার সকল-কিছু মাঝে।—জন্মদিনে, ১২

প্রকৃতির সঙ্গে এই গভীর ঐক্য-অনুভূতি ক্রমে-ক্রমে নিবিড় হয়ে আসছিল তাঁর মধ্যে, কিন্তু নিয়তির ফের অন্যরূপ। ডাক্তাররা অনেক যুক্তি দেখালেন, "এই অপারেশন এত সহজ, এতে কোনো ভয়ের কারণ নেই।" শুনেছি কলকাতায় অপারেশনের পূর্বে ডাক্তাররা যখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছিলেন যে, আমরা এত

সাবধান হচ্ছি যাতে কোনো আর আশঙ্কার কারণ থাকবে না, সাবধানের মার নেই,—তিনি তখনি হেসে উত্তর করেছিলেন, "মারেরও সাবধান নেই।" লাখ কথার এক কথা। তবুও তিনি তর্ক না ক'রে বিজ্ঞানের মতকেই মেনে নিলেন।

এদিকে বাবামশায়ের কলকাতা যাবার দুদিন আগেই আমি হঠাৎ ব্রঙ্কাইটিস ও জ্বরে শয্যাশায়ী হলুম। এই কারণে বাবামশায়ের সঙ্গে আমার যাওয়া হোলো না। ২৫ জুলাই। সেদিন আমার জ্বর খুব বেড়েছিল, নিজে উঠতে পারিনি, খালি কানে এসে পৌঁছচ্ছিল তাঁর যাত্রার আয়োজন, লোকজনের হাঁকডাক, জিনিসপত্রের নামা-ওঠা। এমন সময় নন্দিতা একখানি জন্মদিনের বিশ্বভারতী কোয়াটারলি পত্রিকা আমাকে এনে দিয়ে বললে, "দাদা-মশায় তোমাকে এই বইখানা দিলেন।" এত আনন্দ হোলো, ভিতরের মলাটে তাঁর কাঁপা হাতের অক্ষরে লেখা, "মা-মণিকে, বাবামণি",—তাঁর চিরস্নেহের বাণী, এর কোনো তুলনা নেই, বইখানা মাথায় ঠেকিয়ে বালিশের নিচে রেখে দিলুম। তখন কে জানত এই তাঁর বিদায়ের সংকেত, তাঁর চিরন্তন স্নেহের আশীর্বাদ স্মৃতিতে গেঁথে থুয়ে গেলেন এই বইখানার মলাটের তলায়।

যাত্রার সময় হয়েছিল, নন্দিতা তাই তাড়াতাড়ি চলে গেল। বিছানায় পড়ে আছি, কানে আসছে লোকজনের কোলাহল, বাস্‌-মোটরের আওয়াজ, হঠাৎ শুনতে পেলুম আমাদের ছেলে-মেয়েদের মিলিতকণ্ঠের গান—"আমাদের শান্তিনিকেতন,"—তাদের গুরুদেবকে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের শেষ বিদায়-প্রণতি।

আমার অসুখ বেড়ে গেল, কলকাতা যাওয়া ক্রমশই পিছিয়ে যেতে লাগল, শচীনবাবু[১] রোজ বলেন, দুচার-দিনের মধ্যে আপনি কলকাতা যেতে পারবেন। শচীনবাবু বাবামশায়ের সেবায় বরাবরই ছিলেন কিন্তু আমাদেরই মতো কয়েক জন আশ্রমের রোগীর জন্য গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বাবামশায় শচীনবাবুর উপর এত নির্ভর করতেন যে, পাছে আশ্রমবাসীর কোনো অসুবিধা হয় তাই তাঁকে সঙ্গে নিলেন না। তার পর খবর এল, কাল ৩০ জুলাই বাবামশায়ের অপারেশনের দিন স্থির হয়েছে। আজ বাবামশায়কে একখানি চিঠি না লিখে পারলুম না, যাবার সময় তিনি কত স্নেহে এই বইখানি দিয়ে গেলেন, তাঁকে একটি বার প্রণামও করতে পারলুম না, এ আমার দুর্ভাগ্য ; চিঠিখানিতে তাই তাঁকে

১. আশ্রমের ডাক্তার শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রণাম জানিয়ে লিখলুম, কিন্তু তার উত্তর পাবার আশা করিনি। পরে শুনলুম, অপারেশনের আধ ঘণ্টা আগে তিনি রানী চন্দকে দিয়ে এই চিঠিখানি আমাকে লেখান, এই চিঠিতেই শুনলুম তাঁর কলম শেষ সহি রেখে চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়েছে :

মামণি,

তোমাকে নিজের হাতে লিখতে পারিনে ব'লে কিছুতে লিখতে রুচি হয় না। কেবল খবর নিই আর কল্পনা করি যে তুমি ভালো আছ—অন্তত এখানকার সমস্ত দুশ্চিন্তার ভিতর থেকে দূরে থেকে কিছু আরামে আছ। কিছু তাপ এখনও তোমার শরীরে আছে সেটা ভালো লাগছে না। কেননা ক্ষুদ্র শত্রুর জেদ্‌টাই সবচেয়ে দুঃখজনক। আমাকে প্রত্যহই একটা-না-একটা খোঁচা দিচ্ছেই,—বড়ো খোঁচার ভূমিকা স্বরূপে। শুনেছি, বড়োর আক্রমণ তেমন দুঃসহ নয়। এই সব ছোটো-ছোটোর উপদ্রব যেমন—যা হোক, এরও তো অবসান আছে এবং তারও খুব বেশি দেরি নেই, চুকে গেলে নিশ্চিন্ত থাকব। ইতি

৩০।৭।৪১
বেলা দশটা
জোড়াসাঁকো

বাবামশায়

কণ্ঠ তাঁর এসে থামল কালের সীমায়, বাণীর তাৎপর্য ভরে রইল বিশ্বের শব্দলোক ছাপিয়ে।

অপারেশনের পর রোজই ফোনে খবর আসত সমস্তই ভালোর দিকে, আমাদের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠত যে, এবারের মতো ভয় কেটে গেছে। আমার স্বামী লিখলেন :

বাবার অপারেশনের খবর সঙ্গে-সঙ্গে হয়ে যাবার পরই পাঠিয়েছি—নিশ্চয়ই পেয়েছ। যখন ন'টার সময় টেলিফোন করতে চেষ্টা করলুম তখন বললে লাইন খারাপ। আমি ব'লে রাখলুম লাইন খুললেই যেন কানেকশন দেয়। যখন দিল ঠিক সেই মুহূর্তেই অপারেশন শেষ হয়েছে—তাই খবর আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই পেলে।

সকালবেলা থেকেই দশ-বারোজন ডাক্তার এসে পড়লেন। বারান্দায় সাদা পর্দা দিয়ে অপারেশন-টেবিল ঠিক করে রাখা ছিল। বাবা শেষ পর্যন্ত কিছু জানতে পারেননি। তোমার চিঠি দিয়েছিলুম (অমিতা পড়ে দিল) কিন্তু তখনো ধরতে পারেননি কেন লিখলে। তখুনি চিঠির জবাব লিখে দিলেন,—পাঠাচ্ছি। তার আগে একটা কবিতা লিখেছেন। ললিতবাবু ঠিক দশটার সময় এলেন। সত্যসখাবাবু ও অমিয় বাবু[১] তাঁকে সাহায্য করবার জন্য ছিলেন। কোনো নার্স নেননি। একজন ক্লোরোফর্মের জন্য ডাক্তার ছিলেন গ্যাস নিয়ে প্রস্তুত হয়ে কিন্তু দেওয়া হয়নি। ললিতবাবু নিজেই বাবার কাছে গিয়ে, 'এইবার আপনাকে একটু কষ্ট দেব' ব'লে বারান্দায় নিয়ে এলেন। জ্যোতিবাবু বাবার সঙ্গে কথা বলবার জন্য ছিলেন কিন্তু বেশি কথা বলতে হয়নি, বাবা চোখ বুজে চুপ ক'রে ছিলেন। অপারেশনের সময় ব্যথা লাগছে ব'লে বলছিলেন কিন্তু

১. ডাঃ শ্রীঅমিয় সেন

ডাক্তাররা বললেন সেটা অনেকখানি সাইকলজিকাল। অপারেশন হয়ে যাবার পর দু-ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন। তার পর গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। এখন বিকেল বেলা বেশ স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছেন। কোনো গ্লানি নেই। জ্বর ৯৮° ৪° অন্য দিনের চেয়ে কম।

এখন আর ভাবনার কিছু নেই।

কিন্তু হঠাৎ হাওয়ার গতি যেন বদলে গেল, তেসরা অগস্ট খবর এল অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, ভালো নয়। মন একেবারে দ'মে গেল, শচীনবাবুকে সঙ্গে ক'রে সেই বিকেলের দিকেই কলকাতা রওনা হলুম। জোড়াসাঁকো পৌঁছে শুনলুম তখনকার মতো একটু ভালো। যখন তাঁর ঘরে গেলুম তিনি তখন ঘুমচ্ছেন তাই অপেক্ষা করে রইলুম, ঘুম ভাঙলে আবার দেখা হবে। দুপুরবেলা একটু চেতনা ফিরে এসেছিল, সুধাকান্ত ও আমি অনেক চেষ্টা করলুম বোঝাতে যে আমি এসেছি। অল্পক্ষণের জন্য বুঝতে পারলেন, একবার বললেন, "তাঁকে বসতে বলো, আমার দেহটা এখন বড়ো কষ্ট দিচ্ছে।" আবার চোখ বুজলেন, কোনো সাড়াশব্দ নেই। মন খারাপ হয়ে গেল, বুঝলুম চৈতন্য আচ্ছন্ন, সেদিন আর চেতনা পরিষ্কার হোলো না। তার পরদিন সকালে একটু ভালো ছিলেন। আমি যখন তাঁর কানের কাছে গিয়ে ডাকলুম, "আমি এসেছি, আপনার মা-মণি।" তখন একবার প্রসন্নচোখে পূর্বের

মতো বিস্তারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, বুঝলুম এবার সত্যিই চিনেছেন। "জল খাবেন?"—জিজ্ঞাসা করতে 'হ্যাঁ'-র মতো অস্ফুট উচ্চারণ করলেন, আমি একটু-একটু জল তাঁর মুখে দিতে লাগলুম, ধীরে-ধীরে খেলেন। এই আমার হাতে তাঁকে শেষ জলদান। ছ'ই অগস্ট বিকেল থেকে সকলে বুঝল, আর আশা নেই। কিন্তু চলল যমে-ডাক্তারে লড়ালড়ি। আমি আর তার খুঁটি-নাটি খবরের দিকে যাব না কারণ অনেকেই এ-বিষয় লিখেছেন।

আজ শ্রাবণ-পূর্ণিমার রাত, আকাশ স্তব্ধ, লেগেছে রাখি-বন্ধনের লগ্ন। সন্ধ্যা থেকেই সকলে জানত আজকে তাঁর জীবনসংশয়, বারাণ্ডায় মাঝে-মাঝে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, ডাক্তারদের অনেকগুলো গাড়ি নিঝুম দাঁড়িয়ে আছে উঠনে, রুগীর ঘরে আলো জ্বলছে, বুঝছি অবস্থা ভালো নয়, ভালো বোধ করলে আলো নিবনো থাকে। কিছু খবর নিতেও সাহস হচ্ছে না, কী জানি, কী শুনব। লোকজন পা টিপে-টিপে যাতায়াত করছে, যেন একটা থমথমে ছায়া পড়েছে বাড়ির চারিদিক ঘিরে। চাঁদের আলো যেন ম্লান। একবার উঠছি, একবার বসছি। আমার নার্স আজকের ভাব কী ক'রে বুঝবে,

সে খালি অনুযোগ করছে যে, আমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

এরি মধ্যে হঠাৎ কখন্ একটু তন্দ্রা এসেছিল এমন সময় সুধাকান্ত ও রানী এসে বললে, "বৌদি চলুন।" বুঝলাম কেন এ ডাক্, কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার সাহস নেই, পা যেন সরে না, তাদের সঙ্গে চলে গেলুম ঘরের দিকে, বুঝলুম মহাপুরুষ আজ মহাপ্রয়াণের পথে। আজ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে রাখিবন্ধন-লগ্ন। যে-মৃত্যুকে তিনি কত বৃহৎ ক'রে, কত গভীর ক'রে অনুভব করেছেন, আজ তারি সঙ্গে মিলনের দিন এসেছে এগিয়ে। চেতনা তাঁর মিলে যাচ্ছে :

ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সংগমে ॥—জন্মদিনে, ১২

গুরুদেবের আরাধনা-লব্ধ মন্ত্র ছিল "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" এই মন্ত্রকেই তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত সাধনা করে গেছেন। তিনি বলতেন, "এই মন্ত্রই পেয়েছি।" তাঁর ধ্যানের মধ্যে জ্ঞানের আলোকে, এই প্রাচীন মন্ত্র নব জন্মলাভ করেছিল, অমৃতকে অনুভব করার সাধনাই ছিল তাঁর কবিজীবনের উদ্দেশ্য। যিনি পৃথিবীর ধূলিকণার মধ্যেও সেই "আনন্দরূপমমৃতমের" সন্ধান পেয়েছিলেন, আজ কি তাঁর আত্মা চিন্ময়লোকে সেই রসে নিবিষ্ট

নন। তাঁর বরণডালা তিনি তো নিজেই সাজিয়েছেন, আমাদের তো কিছু করবার নেই, পাশে ব'সে বুকের উপর হাত রাখলুম, তখনো দেহের অণু-পরমাণুর সঙ্গে চেতনার নিবিড় দ্বন্দ্ব চলছে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য। মুখ দিয়ে আজ আপনি বেরিয়ে এল যে-মন্ত্রে ত্রিশ বছর আগে এই বাড়িরই ঠাকুরদালানে দীক্ষিত করেছিলেন তাঁর মা-মণিকে—'অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়।'

দিনের আলো ফুটে উঠেছে, নিশ্বাসও আসছে ধীরে-ধীরে শান্ত হয়ে। পূজনীয় রামানন্দবাবু সাতটার সময় এসে তাঁর খাটের কাছে বসে উপাসনা করলেন। বাড়ির মেয়েরা ক্ষণে-ক্ষণে তাঁরি রচিত ব্রহ্মসংগীত গেয়ে উঠছেন, স্তবের গুঞ্জনধ্বনিতে ঘরের মধ্যে দেবালয়ের আভাস উঠছে জেগে। সকালের আলোর সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে উঠছে লোকের ভিড়,—আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, অজানা অনাহূত কত কে। মনে হচ্ছে সবি ছায়াবাজি, মায়া; কী ভীষণ মিথ্যা এই পৃথিবী, যেন ভোজবাজির চাদরে ঢাকা। যা সত্য তারি অনন্ত সংগমে চলেছেন গুরুদেব, তাঁর শেষ নিশ্বাস ক্রমে-ক্রমে সমে এসে থামল। সকলের মন-মধ্যে মুহূর্তের জন্য অসীমের অনুভূতি নিবিড় রূপ নিল। বৃহস্পতিবার সাতই অগস্ট বারোটা দশ

মিনিটে গুরুদেবের নির্লিপ্ত আত্মা দেহবন্ধন থেকে মুক্তি পেল।

সেবিকারা তাঁর পবিত্র দেহ সাজিয়ে দিল শুভ্র ধুতি উত্তরীয়ে। ললাটে আঁকা হোলো শ্বেতচন্দনের তিলক, গলায় রজনীগন্ধার গোড়ে—তাঁর যে-বেশ কত উৎসবের কত অনুষ্ঠানকে সুন্দর করে তুলত, সার্থক করে তুলত, আজ সেই বেশে তাঁর বিচ্ছিন্ন চৈতন্যের দেহেও আধ্যাত্মিক রূপ দীপ্ত হয়ে উঠল। যে-দেহ তিনি পেয়েছিলেন সে তাঁরি চেতনার ও জ্ঞানের উপযুক্ত আধার। তিনি 'জন্মদিনে'তে যা লিখে গেছেন তাঁকে শেষে তেমনি করেই সাজানো হোলো ঃ

> অলংকার খুলে নেবে একে-একে, বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে
> ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা ;
> তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
> সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
> দিগন্তের পরপারে শুভ শঙ্খধ্বনি। —জন্মদিনে, ২৯

কিন্তু সেই 'শুভ শঙ্খধ্বনি' আমাদের কানে পৌঁছবে কেন। আমরা যে মায়ার জীব, দিব্যদৃষ্টি তো আমাদের নেই। এদিকে বৃহৎ সমুদ্রের কলরব শুনছি বাইরে। জানলাদরজার উপর পড়ছে ভীষণ করাঘাত, যেন মনে

হচ্ছে সমুদ্রের তরঙ্গ-আঘাতে সমস্ত বাড়িটা ভেঙে পড়বে। ভূমিকম্পের কাঁপন উঠছে চারিদিকে। কে যেন এসে বললে এইবার ওঁকে নিয়ে যাচ্ছে, শোকযাত্রা শুরু হবে। দৌড়ে দেখতে গেলাম জানলা দিয়ে, শেষ দর্শন হোলো না। একটা প্রকাণ্ড মানবসমুদ্রের ঢেউ তাঁর দেহ গ্রাস করে নিল চকিতে। যে-মহামানব তাঁর ধ্যানের উপলব্ধি, সেই বিরাট মানবহৃদয়ের সাগর থেকে আজ বান ডেকে উঠেছে। তারি উত্তাল তরঙ্গ তাঁর দেহকে পার্থিব জগৎ থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল, আর তাঁর মহান আত্মা ব্যাপ্ত হোলো ভূমার নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতায়। সেদিন :

দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
কে তুমি,
পেল না উত্তর ॥